কংগ্রেস মতবাদ

কংগ্রেস মতবাদ

হুমায়ুন কবির

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥
শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০

কলিকাতা ৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, জে· এন· বসু এণ্ড কোং হইতে শ্রীদীপঙ্কর বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৮৬-এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড, লোক-সেবক প্রেসে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

আজীবন কংগ্রেসসেবী

শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

করকমলেষু

মুখবন্ধ

১৯৫৮ সালে ধেবরভাইয়ের সঙ্গে কংগ্রেস মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে, কংগ্রেসের কর্মসূচীর দার্শনিক ভিত্তির বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়নি বল্লেই চলে। বহু মণীষি এবং দেশপ্রাণ নেতার আজীবন সাধনার ফলে কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা নিয়ে তাঁরা এত ব্যস্ত ছিলেন যে, মতবাদের বিশ্লেষণ ও আলোচনার সময় বা সুযোগ পান নি। হয় তো তার প্রয়োজন বোধও করেন নি।

দেশ যতদিন স্বাধীন হয় নি ততদিন স্বাধীনতা লাভই প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে এ ধরনের বিচার না করলেও কংগ্রেসের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। আজ স্বাধীন দেশে নতুন নতুন মতবাদের বিকাশ দেখা দিয়েছে; তারা বিভিন্নভাবে দেশের ভবিষ্যৎ রূপ ও প্রগতির বিষয় চিন্তা করে, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের নিজেদের মতবাদ ও আদর্শ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি ও সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করা দেশ ও কংগ্রেস উভয়ের জন্যই প্রয়োজন।

সেই প্রয়োজনের তাগিদে ধেবর ভাইয়ের অনুরোধে ইংরাজীতে কংগ্রেস মতবাদের একটি খসড়া সে সময় তৈরী করি।

পণ্ডিতজীকে সেই খসড়া দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কয়েকটি অংশের সমালোচনা করে বলেন যে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গীতে কংগ্রেসের যে আদর্শ ধরা পড়েছে তুমি তারই বর্ণনা দিয়েছ। কাজেই অন্যের স্বীকৃতির জন্য তার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই। তবু তাঁর মন্তব্য অনুসারে প্রবন্ধটির কিছু কিছু অদল-বদল করি এবং ভাবনগর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের তরফ থেকে তা প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটি গুজরাটী, হিন্দি প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় পূর্বেই অনুবাদ করা হয়েছে। আমার তরুণ বন্ধু শ্রীনিমাই নাগ চৌধুরীর আগ্রহে তার বাংলা অনুবাদ করে চতুরঙ্গে গত বৎসর প্রকাশ করি। তারই উৎসাহে প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হল। যদি এ আলোচনার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের আদর্শ ও মতবাদ সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের ধারনা স্পষ্টতর হয়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

২৯, জুলাই ১৯৬০ — হুমায়ুন কবির

কংগ্রেসের যাঁরা সমালোচক তাঁরা প্রায়ই বলেন কংগ্রেসের কোন আদর্শ বা মতবাদ নেই। মতবাদ বলতে যদি বাঁধাধরা কতকগুলি বিশ্বাস বা সংস্কারের সমষ্টি বোঝায় এবং কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে সেই মতবাদ থেকেই আমরা সকল রকম কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করি, তবে হয়ত এ অভিযোগ সত্য বলে মানতে হয়। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে কংগ্রেস ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ভিত্তিতে নিজস্ব আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সমান সত্য যে কোন নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় মতবাদকে তার রাজনৈতিক ধর্ম বলে কংগ্রেস অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসরের ইতিহাসে তাই বারবার দেখি যে যখনই সমাজের সম্মুখে নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার দাবী মেটাবার জন্য কংগ্রেস নূতন কর্মসূচীর উদ্ভাবন করেছে। এই জন্যই ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের সঙ্গে ১৯৬০ সালের কংগ্রেসের অনেক তফাৎ॥

এক

চাকুরীর মাধ্যমে দেশের সরকারী কাজে ভারতবাসী অংশ গ্রহণ করুক এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রথম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সে চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পৌর অধিকারের জন্য সংগ্রাম কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ২০ বৎসর নাগরিকের এইসব মৌলিক অধিকার লাভই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী যুগে কংগ্রেস জনসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী উত্থাপন করে এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য জনগণের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এই লক্ষ্য সফল করবার জন্য প্রথম প্রথম কংগ্রেস সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং

সাংবিধানিক পথ অবলম্বন করেছিল। কাজেই সে যুগে কংগ্রেসের দাবীগুলি ব্রিটিশ শাসনের প্রতিকূল মনে হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে মুক্তিলাভের দাবী সে কালেও উঠেছিল, কিন্তু যে সব বিপ্লবী সংস্থা সে দাবী তোলে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে সমগ্র প্রাচ্যে এক নবজাগরণের সূচনা দেখা দেয়। বুয়র যুদ্ধের কালেই ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস অনেকখানি ভেঙে গিয়েছিল। আবিসিনিয়ার হাতে ইতালির পরাজয় ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের ফলে এশিয়ার দেশগুলিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। উনিশ শতকের শেষে নবীন তুরস্ক আন্দোলন শুরু হয় এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিকে আলোড়িত করে। এশিয়ার এ নবজাগরণের চাঞ্চল্য ভারতবর্ষেও দেখা দেয় এবং লর্ড কার্জনের শোষণমূলক নীতির ফলে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে এক নূতন সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের ফলে সমগ্র দেশের ধূমায়িত আক্রোশ প্রজ্বলিত হয়ে এক সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে।

কেবলমাত্র নাগরিক অধিকারের দাবীর বদলে সমগ্র ভারতবাসীর কণ্ঠে জন্মগত অধিকার হিসাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী মন্দ্রিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ এবং মহারাষ্ট্রে তিলক জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নূতন দাবী উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বারবার আভ্যন্তরীণ স্বাধিকার (Home Rule) দাবীর মধ্যে এই নতুন জাগরণের প্রকাশ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি আভ্যন্তরীণ স্বাধিকারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলে ঘোষণা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং রাষ্ট্রপতি উইলসন কর্তৃক প্রত্যেক জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণার ফলে ভারতবর্ষের এই জাতীয় দাবী আরো প্রবল হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী সেদিন কংগ্রেসের সামনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের এক নূতন কর্মসূচী পরিবেশন করেন। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাব এক নবীন বিপ্লবের সূচনা এনে দেয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য অবশ্য বদলায়নি, কিন্তু কর্মপন্থাতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংবিধানবিরোধী ও আইনবহির্ভূত যে সব আন্দোলন শুরু হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত-

শাসন অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাদেরও লক্ষ্য ছিল। এমনকি ১৯২৮ সালেও মতিলাল নেহরু রিপোর্টে ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হিসাবে কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবীই উল্লিখিত হয়। ১৯২৯ সালেই প্রথম কংগ্রেস তার রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে পূর্ণস্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে। এবার কেবল পদ্ধতি নয়, কংগ্রেসের লক্ষ্যেও ধারণাতীত পরিবর্তন এল। সরকারী কার্যে অধিক অংশ গ্রহণের অধিকার সংগ্রহের জন্যই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কালক্রমে তার রূপ বদলে আইনানুগ ও সংবিধানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনই কংগ্রেসের প্রধান কার্যক্রম হয়ে দাঁড়াল। সে কালের কংগ্রেসকে বিপ্লবী সংস্থা বলা চলে না। সমাজের নেতৃস্থানীয় বিশ্বজ্জনের প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সেদিন কংগ্রেস মর্যাদা লাভ করেছিল। তারপরে পরিবর্তনের পালা আরো দ্রুত হয়ে উঠল। এক দশকের মধ্যেই আবেদন নিবেদনের পালা শেষ করে সংবিধানবহির্ভূত আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান কংগ্রেসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংস্থা কংগ্রেস এইভাবে সংগ্রামশীল বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হল।

লক্ষ্য, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় প্রথম কংগ্রেসের সম্মুখে ভারতীয় গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী উপস্থাপিত করেন। ফলে স্বদেশী যুগে বহু সংগঠনমূলক কর্মীর আবির্ভাব হয়। সরকারের সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজেদের চেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পজীবন উন্নয়নের বিভিন্ন প্রয়াস দেখা দেয়। অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণের সময় গান্ধীজীও গ্রামীণ শিল্প ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। নতুন ধরনের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধারা কিন্তু মূলতঃ অব্যাহত থাকে।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের ইতিহাসে আবার এক বিরাট পরিবর্তন আসে। করাচী অধিবেশনেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজকে কংগ্রেস তার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে প্রথম স্বীকৃতি জানায়। এই পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব শ্রীজওহরলাল নেহরুর। রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে

রাজনৈতিকদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করতে পারেননি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে গান্ধীজীর মতামত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেননি। গান্ধীযুগে বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়কে জওহরলালই কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে কংগ্রেস কর্মসূচীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করার জন্যও জওহরলালই প্রধানত দায়ী। বামপন্থী গোষ্ঠিগুলিতে এম. এন. রায় অনেক সমর্থক ও অনুরাগী পেয়েছিলেন কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অটুট নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা ভিন্ন করাচী অধিবেশনের কর্মসূচী গ্রহণ কখনই সম্ভব হত না। সেই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে দেশের বিদ্বানসমাজ ও তরুণ সম্প্রদায় কংগ্রেসকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে শিখল।

১৯৩০-৩১ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনকেও প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সেই সময় থেকেই আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা জনসাধারণের সামনে বিভীষিকার মতন দেখা দেয়। এই সংকটের দিনে আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে ভারতবাসী অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে পৃথিবীকে সাবধান করেছিলেন, বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি ভিন্ন বর্তমান যুগে মানুষের কল্যাণ নেই। অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে, ১৯১২ সালে, মওলানা আজাদ বিশ্লেষণ করে দেখান যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেশবন্ধু দাশও এ সম্বন্ধে অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তবু বলা দরকার যে এই ব্যাপারে কংগ্রেস নীতির নবপরিবর্তনের জন্য কৃতিত্ব জওহরলালকেই দিতে হবে। তিনি যেভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনা ও শক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমাগত দেশকে সচেতন করেন, তারই ফলে আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অভ্যন্তরীণ সমস্যার বিচার কংগ্রেসের চিন্তাধারার রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালে করাচীতে সেই স্বাধীনতার অর্থনৈতিক রূপ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্যে ও কর্মসূচীতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ১৯৪২ সালের যে আন্দোলন, তার মধ্যেও কোন নূতন রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় মেলে না, কংগ্রেসের অতীত রাজনৈতিক

কর্মসূচীর ভিত্তিতেই সে আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই ষোল বৎসরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনার সংঘাত ও পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যই কংগ্রেসের কর্মসূচীতে প্রয়োজনমত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, কিন্তু আদর্শ বা কর্মধারা প্রায় অব্যাহত থাকে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৪৭ সালে কিন্তু কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডমিনিয়ন হিসাবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাহার করা হল। আসলে কিন্তু কংগ্রেসের নতুন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বাস্তববোধের পরিচায়ক। স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেস নানা কারণে আন্দোলনকেই বড় করে দেখেছে। আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৩৭ সালে আয়ত্ত ক্ষমতা তাই সব সময়ে ঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি। দেশবন্ধু দাশ এবং পরে সুভাষচন্দ্র বহুবার এ বিষয়ে কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতার ছায়া পরিত্যাগ করে কায়া অধিকারের দিকে দৃষ্টি দিল।

১৯২১ সালে ডমিনিয়ন ব্যবস্থাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ডমিনিয়ন ব্যবস্থা ও পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল। বরং বলা চলে যে বর্তমান আণবিক যুগে যখন আমেরিকা বা সোভিয়েট রাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রও কেবল একক শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে দ্বিধা বোধ করে, তখন কমনওয়েলথের সম্বন্ধবদ্ধ বিভিন্ন ডমিনিয়নের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্বাধীনতাকে ব্যাহত না করে বরং আত্মরক্ষার সুযোগ ও সুবিধা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত কমনওয়েলথ পরিকল্পনায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছামূলক সংযোগে যে সংস্থার উদ্ভব হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো তারই ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের সংযোগে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। কমনওয়েলথের পরিকল্পনায় যে ভবিষ্যত রাষ্ট্ররূপ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, প্রাক্তন ফরাসী সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার পরে ফরাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে তারই ক্রমবিকাশ দেখা যায়। বোধ হয় ইয়োরোপীয় কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা তারই তৃতীয় পদক্ষেপ। এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের

এক সুদৃঢ় সংস্থার আবির্ভাব হতে পারে। যেদিন এ পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করবে, সেদিন স্বাধীনতা অপেক্ষা পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই সভ্যসমাজের মূল আইনরূপে স্বীকৃত হবে।

কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক চেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পৃথিবীতে রাষ্ট্র আজ বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বগ্রহণে ও সর্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় সমাজ-কল্যাণসাধনে অগ্রণী। সমাজের সর্বশ্রেণীর এই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনার রূপ সমাজতন্ত্রের আদর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রগাঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনের পূর্বে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবাদি অধি-বেশনে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর নীতি গৃহীত হল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সর্বোদয়ের আদর্শকে গ্রহণ করে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনাকে এক নতুন সমৃদ্ধ রূপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর অগ্রগতির সুযোগ দানের নীতিকে কংগ্রেস স্বীকার করে নিল। ভারত আজ কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে সমাজের প্রগতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করা হবে কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতার প্রমূল্যের লেশ-মাত্র হানি কংগ্রেস স্বীকার করবে না। ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শক্তির উন্মেষের ব্যবস্থা হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণের যে কর্মসূচী কংগ্রেস সম্প্রতি গ্রহণ করেছে তার ধরণ ও বৈচিত্র্যের তুলনা পৃথিবীতে বিরল।

কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থার পরিবর্তন ও অগ্রগতির এই বিবরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে শুরু থেকেই কংগ্রেসী মতবাদ ও কর্মসূচী অভিজ্ঞতানির্ভর ও সহজে পরিবর্তনীয় ছিল। ভারতবর্ষের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী চিরকাল গোঁড়ামি বর্জন করে পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করেছে। বাস্তবে যে বহু ধারা আছে এবং সত্যের উপর কারো একচেটিয়া অধিকার নেই, এ সত্য বহু যুগ পূর্বে ভারতীয় দর্শন উপলব্ধি করেছিল। ভারতের ইতিহাসের শুরু থেকে আমরা দেখি যে নানা ধর্মীয় জীবনযাত্রা এদেশে সহঅবস্থান করছে। ভারতীয় চিন্তাধারা স্বীকার করত যে জীবনযাত্রার সকল ধরণধারণের মধ্যেই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য কোন মতকে সম্পূর্ণ স্বীকার করা অথবা কোন মতেরই আমূল বিলুপ্তি

ঘটানো সম্ভব নয়। ভারতবাসী মনে করে কোন একটি পথ বা সত্যকে চরম বা সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা অযৌক্তিক। প্রত্যেক মতের আংশিক সত্যতা বা উপযোগিতাকে স্বীকৃতিদান এবং কোন একটি মতের সম্পূর্ণ সত্য উপলব্ধির পূর্ণ অধিকারকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন—এই দুয়ের সমন্বয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনকে সহজে স্বীকার করতে পেরেছে। ফলে ভারতীয় দর্শনদৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের যে উদার স্বীকৃতি, দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা বেশী মিলবে না।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই উদারতার ফলে ভারতবর্ষ চিরকালই বিভিন্ন দেশ ও সমাজের বিভিন্ন চিন্তা আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। জীবনধারা ও সত্য বহুমুখী, তাই যেখানেই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে, সে চেষ্টায় সার্থকতার দাবীকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিমর্যাদাকে স্বীকৃতিদান এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তত আংশিকভাবে সত্য উপলব্ধির শক্তি আছে, অন্যপক্ষে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্পূর্ণ সত্য লাভ সম্ভব নয়, এই বিশ্বাস ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি। তার ফলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে কোন ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ বা সম্পূর্ণ বর্জন করা অযৌক্তিক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার প্রাপ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদান করতে হবে। সকল মানুষকে ব্রহ্মের প্রকাশ বলে ঘোষণা করে ভারতীয় আদর্শ এই নীতি স্বীকার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হয় যে আদর্শ ও নীতিগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করলেও সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভারতবর্ষে বহুক্ষেত্রেই এই আদর্শকে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধ মতবাদ বিলুপ্ত হবার পর থেকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিবৈষম্য আরো দৃঢ়ভাবে কায়েম হল এবং ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের প্রভাবেও সে অন্যায় পুরোপুরি দূর হয়নি।

সত্যের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্য সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সার্থক হয়নি, কিন্তু কালপ্রবাহে সমাজে ও চিন্তায় যে সব পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে, তা তাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। ব্যক্তি কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্য উপলব্ধি করতে পরে, তাই বাস্তবের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সদাসর্বদা তাকে সচেষ্ট থাকতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময় সত্যের বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করেন। মানুষের কাছে পৃথিবী তাই অনন্ত পরিবর্তনের লীলাক্ষেত্র বা সংসাররূপে প্রতিভাত। বাস্তবের ক্রিয়া এবং প্রকাশের উপর নির্ভর করে যাঁরা তার স্বরূপ বুঝতে চান, তাঁদের

সামনে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত চাঞ্চল্যই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এ রকম ধারাবাহিক অসংখ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্যের পূর্ণরূপ উপলব্ধি করা কিন্তু সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা অনিত্য ও চিরচঞ্চল। তবু মানুষ তার অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভরশীল এবং ঐ অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে চরম সত্যের পরিচয় পাওয়ার সাধনা তাকে করতে হবে। ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীই তাই বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরিবর্তনের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী।

কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। তাই তার আদর্শ ও কর্মসূচীতেও পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীলতার মৌলিক স্বীকৃতি মেলে। ভারতীয় অভিজ্ঞতার এই স্বীকৃতিও কংগ্রেসের বাস্তববোধের লক্ষণ। বাস্তবের সঙ্গে যোগের ফলে ভারতীয় মনে কংগ্রেস গভীর দাগ কেটেছে। গত ৭৫ বৎসরে প্রত্যেক স্তরে সমসাময়িক কালানুবর্তী সামাজিক অভিজ্ঞতা ও প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কংগ্রেসের আদর্শ সূচিত হয়েছে। অনেকে আপত্তি করেন যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক, এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও নীতিও বদলেছে। যাঁরা গুরুবাদী, তাঁরা এ ধরনের সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান যুগে যে দ্রুতগতিতে সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের, বস্তুতপক্ষে সমগ্র সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম পরীক্ষামূলক মনোভাবকে সমালোচনার পরিবর্তে অভিনন্দিত করা উচিত। সত্যের বিভিন্ন প্রকাশকে স্বীকার করবার যে মনোবৃত্তি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে কথা মনে রাখলে আদর্শ ও কর্মসূচীর ব্যাপক কাঠামোর মধ্যেও কংগ্রেস নানারূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেন দিয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে একই আদর্শ গ্রহণ করেও সেই আদর্শের উপলব্ধি বা প্রয়োগের ব্যাপারে মতবিরোধ থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, বোধ হয় অনিবার্য। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এই ধরনের মতভেদ রয়েছে বলে কংগ্রেসের কর্মপন্থায় পরিবর্তন আনা অনেক সহজ। অনায়াসে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংগঠনের দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং শক্তির পরিচায়ক।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কংগ্রেসের পরিবর্তনের প্রবণতা তরুণ মনে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে যুব সমাজের সম্মুখে যে সকল বাধা, বোধ হয় পূর্বের কোন যুগের যুবক সমাজ সে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়নি। বিজ্ঞান ও

যান্ত্রিক প্রগতি পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও আরামের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাঁচার পথে নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। প্রায় তিনশো বৎসর ধরে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে প্রথমে জাতীয় রাষ্ট্র এবং বর্তমানে বিশ্বরাষ্ট্র প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবৃত্তির দিক দিয়ে বহু ক্ষেত্রে মানুষ আজও উপজাতির স্তর অতিক্রম করে নি। উপজাতিসুলভ মনোবৃত্তি জাতীয় রাষ্ট্র-গঠনের সময়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, বর্তমান আণবিক যুগে উপজাতিসুলভ মনোবৃত্তি মানুষের অস্তিত্বের পক্ষেও বিপদজনক। অতীতের তুলনায় বর্তমানে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজ পরিবর্তনশীলতা আরো বেশী প্রয়োজন। আজ যারা তরুণ বা যুবক, যুগের সমস্যা সমাধানে কাল তাদেরই বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থার মধ্যেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছে, তাই কংগ্রেস সংগঠনে বর্তমান যুগের বিচিত্র সমস্যার নূতন সমাধানের পথ তরুণ সম্প্রদায় যত সহজে করতে পারে, পৃথিবীতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সংগঠনে বোধ হয় তার নজীর মিলবে না। কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে পুরাতন বিশ্বাস ও কর্মপন্থা আঁকড়ে থাকতে চায়, বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের নামে ভয়ে আঁতকে উঠে, সে কথা স্মরণ করলেই কংগ্রেসের মুক্তবুদ্ধি ও নতুনকে গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

দুই

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সহজ পরিবর্তনশীল মনোভাবের শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী উত্থাপন করা হচ্ছে, অন্য রাজনৈতিক দলের সভ্যারা নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করবেন। রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে না, কারণ মূল্যায়নের বিচার আমাদের অনুসন্ধানের ধারাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। ভারতীয় জনগণের স্বীকৃতি লাভের জন্য যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ উদগ্রীব, কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের রাজনীতি ও কর্মপন্থার তুলনামূলক বিচার করলে এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ঐতিহাসিক বিবেচনায়, গুণগত বিচারে ও দলীয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের বাইরে যে দল প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার নাম

প্রজা সমাজতন্ত্রী দল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক প্রজা মজদুর দলের সংযোগের ফলে এ দলের উৎপত্তি। ইচ্ছা করেই সংযোগ বা coalition কথাটির ব্যবহার করছি। কারণ মনে হয় এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলেও দুই দলের আদর্শের সমন্বয় ঘটেনি। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের দুই শাখার নেতৃবৃন্দই প্রথমাবস্থায় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বী দুই উপদলরূপেই তাঁরা কাজ করেছেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ মূলতঃ মার্ক্সবাদী ছিলেন কিন্তু খানিকটা গান্ধিজীর প্রভাবে ও খানিকটা ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার চাপে ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদ পরিহারে তৎপর হন। অপরদিকে কৃষক প্রজা মজদুর দল গান্ধিজীর অনুগামীরূপেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ও গান্ধিজীর প্রায় সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। বিরোধী পটভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠিত এই দুই দলের মধ্যে যে মিলন ঘটেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। মতের মিল অপেক্ষা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভিত্তিতেই দুই দলের নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে কাজ করতে স্বীকার করেছেন, একথা বললে অন্যায় হবে না। সংযোগের পরেও উভয় দলের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন কিন্তু সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের অভ্যন্তরে যে অনিশ্চয়তা ও দলাদলির পরিচয় মেলে, তার জন্য দলের রাজনৈতিক সংহতির অভাব ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসঙ্গতিই প্রধানত দায়ী।

প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেসের আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রণয়নে এই দল সক্ষম হয় নি। কংগ্রেসের ন্যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি এই দল গ্রহণ করেছে। আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের মতৈক্য স্পষ্ট, কিন্তু তবু রাজনৈতিক প্রয়োজনে কর্মসূচীর মতানৈক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মসূচীর তথাকথিত পার্থক্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে তা নইলে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পৃথক অস্তিত্বের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এটা দুঃখের কথা যে গণতন্ত্র প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল আজ পর্যন্ত নিজস্ব এক রাজনৈতিক দর্শন তৈরী করতে পারে নি। বিভিন্ন মতের স্বীকৃতি ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মৌলিক প্রশ্নে মতের

ঐক্য সত্ত্বেও মতের প্রকাশ ও পুঙখানুপুঙখ বিচারে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকে। মৌলিক প্রশ্নে যদি বোঝাপড়ার অভাব হয়, তবে সমাজে ভাঙন ধরে। অন্যপক্ষে মতের বৈচিত্র্যের অভাব হলে একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম হয়ে উঠে। মৌলিকনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে মতৈক্য এবং রাজনৈতিক কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে মতবিরোধ থাকার দরুণ এক সময় মনে হয়েছিল যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের এক বিকল্প গণতান্ত্রিক সংস্থারূপে আবির্ভূত হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দলীয় চিন্তাধারায় মার্ক্সীয় ও গান্ধীবাদী মতবাদের সমন্বয় ঘটল না। তার ফলে কংগ্রেসের বিকল্প কোন রাজ-নৈতিক মতবাদ গড়ে উঠল না, কেবলমাত্র বিরোধিতা করবার জন্য প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে। এইসব কারণে দলটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে নি; বরং চিন্তায় ও কর্মে অনিশ্চয়তা প্রদর্শন করছে। সুস্পষ্ট আদর্শ এবং বাস্তব কর্মপন্থার অভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের কাছে যে সার্থকতা আশা করা গিয়েছিল তা পূরণ হয়নি। তার আর একটা দুঃখজনক ফল এই যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের বিকল্প এক গণতান্ত্রিক সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে কম্যুনিস্ট দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ফলে ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কোন কোন সমালোচক এই প্রসঙ্গে আপত্তি তুলতে পারেন যে কংগ্রেসের বিকল্প সংস্থারূপে এককভাবে বা যুক্তভাবে রক্ষণশীল দলগুলির আবির্ভাব হতে পারে। এ ধরনের চিন্তার মূলে গলদ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াপন্থী দলগুলি রাজনৈতিক বিচারে কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে না। হিন্দু মহাসভা হোক বা জনসংঘ হোক অথবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘই হোক, এই দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হলেও একটিমাত্র সম্প্রদায়ের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির জটিলতা ও ব্যাপকতা হয় উপলব্ধি করতে পারে নি, নয়ত অসম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছে। ভারতের সুপ্রাচীন অতীতের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে এসব দলের নেতারা ভুলে যান যে অতীতের গৌরবময় যুগে বিদেশী চিন্তাধারা ও প্রভাব অনুপ্রবেশের পথ ভারত রুদ্ধ করে নি। তাঁরা হয়ত জানেন না যে 'পুস্তক' 'কলম' 'কালি' ইত্যাদি অনেক মৌলিক শব্দ গ্রীকভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়। অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের দানকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে

অত্যধিক আগ্রহের ফলে এই সমস্ত দল রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধী, তাই তারা বর্তমান যুগের বিরাট পরিবর্তনকে স্বীকার করতে অক্ষম। তারা যে কোন দিন সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের আদর্শ ও আশার মুখপাত্ররূপে উপস্থিত হবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গঠন সে সম্ভাবনাকে লুপ্ত করেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে গঠিত দলগুলি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত মুসলিম লীগের ন্যায় রক্ষণশীল দল সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশী খাটে। বস্তুতপক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া শুধু স্বার্থের পরিপন্থী নয়, মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের মনোভাব জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে। প্রত্যেক সম্প্রদায় বা অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা রক্ষা করাও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন, কিন্তু সমগ্র জাতি বা দেশের ঐক্য রক্ষা প্রত্যেক অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য আরো বেশী প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা বারবার দেখি যে একটি ব্যাপক ব্যবস্থা বা কাঠামোর মধ্যে যখনই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারাগুলির সমন্বয় সম্ভব হয়েছে তখনই ভারতীয় জীবন সমৃদ্ধ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে। রাজনীতির বা অন্য কোন ক্ষেত্রে অংশবিশেষের দানকে অস্বীকৃতি বা অবহেলা ক'রে ভারত সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয় নি। সমস্ত বিভেদ লোপ করে যে বৈচিত্র্যহীন ঐক্য, সে পথে ভারতবর্ষ চলে নি। সমস্ত পার্থক্যকে স্বীকার করে ও সঞ্জীবিত রেখে তাদের মধ্যে ঐক্য সাধনই ভারতের বিস্ময়জনক জীবনীশক্তির গোপন সূত্র। এই প্রাচীন সত্যকে যখনই ভারত ভুলেছে, তখনই নানাভাবে ভারত-বর্ষকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

সাফল্যলাভে প্রয়াসী যে কোন রাজনৈতিক দলকেই ভারতবাসীর বৈচিত্র্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখিতাকে স্বীকার করতে হবে। রক্ষণশীল দলগুলি এই সহজ সত্য উপলব্ধি করেনি, কিন্তু বারবার পুনরাবৃত্তি করলেও মিথ্যা সত্যে পরিণত হয় না। একথা নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত বহুবিধ ধারার সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগের অবদানের সমন্বয়ে গঠিত। রক্ষণশীল দলগুলি ভারতীয় জীবনধারায় মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের অবদানগুলি অস্বীকার করে। ভারতীয় সমাজের আধুনিক প্রয়োজনগুলির সমাধানে তারা তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বস্তুতঃ সুপ্রাচীন অতীতেও ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল বহুমুখী, বহু

সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ভারতবর্ষ হরাপ্পা, আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার এক সমন্বয় রচনা করেছিল। মধ্যযুগে আরব, পাঠান ও তুর্কীগণ নূতন ভাবধারার আমদানি করেছে। আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে দেখা যায় ভারত চিরকালই তার সমৃদ্ধ ও বহুমুখী জীবনধারায় নব নব ভাবধারা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। যুগের ভাবধারা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যারা অগ্রসর হয়, প্রত্যেক স্তরে তারা সাফল্যলাভ করে। যারা অতীতের অচলায়তনকে আঁকড়ে থাকে, তারা ইতিহাসের বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। বর্তমান যুগে বিমান ও কারিগরি শিক্ষার প্রগতি দূরত্বের ব্যবধান ও ভৌগোলিক সীমানার বাধা দূর করে দিয়েছে। পুরাকালেও ভারতবর্ষ বহিরাগত প্রভাবকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই গ্রহণশীল ও পরিবর্তনকামী মনোবৃত্তি আরো বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই ভারতের কল্যাণের জন্য আজ এমন রাজনৈতিক মতবাদের প্রয়োজন যে মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহরিত নব নব ভাবধারাকে গ্রহণ করে ভারতীয় জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারবে, সহজে পরিবর্তনীয় রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে। যে সব রাজনৈতিক দল জাতি বা ধর্ম, সংস্কৃতি বা ভাষার ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার চেষ্টা করবে, সে সব দল ভারতের জাতীয়তাকে দুর্বল করবে। যে দল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার শক্তি গ্রহণে বা আহরণে অক্ষম, বর্তমান পৃথিবীতে সে সব দলের স্থান নেই। উল্লিখিত রক্ষণশীল দলগুলি শুধু যুগের ভাবধারার বিরোধী নয়, ভারতের ঐতিহ্যেরও বিরোধী। ফলে আগামী দিনের ভারতবর্ষে তাদের স্থায়ী আসন নেই।

তিন

কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে এবার শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে গঠিত স্বতন্ত্র দলের আদর্শের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রক্ষণশীল দলরূপে স্বীকৃত হলেও সাম্প্রদায়িক আদর্শে গঠিত অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র দলের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শ্রীরাজাগোপালাচারীর যাঁরা কঠোর সমালোচক,

তাঁরাও ভারতীয় রাজনীতিতে যে অর্থে সাম্প্রদায়িক শব্দ ব্যবহার হয় সেই অর্থে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারেন না। তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন এবং সুস্পষ্ট দ্রষ্টা ও শক্তিমান বুদ্ধিজীবীরূপে বহুদিন হতে সম্মানিত। এতদ্ব্যতীত তাঁর নৈতিক সাহস অনন্যসাধারণ, অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি কোনদিন ভীত হন নি। তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ অবশ্য করা চলে। বারবার দেখা গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ভাবগত ও মনোগত ইচ্ছা উপলব্ধি করতে তিনি অপারগ। এই-জন্যই ধীশক্তির প্রাচুর্য ও অসাধারণ নৈতিক সাহস থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় জন-গণের চিত্তে গান্ধী বা জওহরলালের মতন আসন গ্রহণ করতে পারেন নি। জন-সাধারণের সহিত একাত্মতার মাধ্যমেই ব্যক্তি জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করে। জাতীয় নেতা তাই জাতির অর্ধচেতন ও অবচেতন আশা ও চিন্তাকে উপলব্ধি করে স্বনির্বা-চিত কর্মধারার মধ্যে জাতীয় শক্তিকে সঞ্চালিত করেন। জনসাধারণের সঙ্গে এই সহজ আত্মীয়তার অভাবে রাজাজী সঠিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেও জাতিকে নিজের মতানুযায়ী পথে পরিচালিত করতে পারেন নি। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁর সম-বেদনার অভাব নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের আশা-নিরাশার সাথে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি।

জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সহজ যোগ যে কত শিথিল, তাঁর দলের প্রাথমিক নাম-করণেই তা প্রকাশ পেয়েছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে পরি-বর্তন ও প্রগতির প্রতি বর্তমানে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে না পেরে রাজাগোপালাচারী প্রথমে তাঁর দলের নামকরণ করেন রক্ষণশীল দল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার শক্তি সর্বদাই বিশেষ প্রকট ছিল। রাজাজী হয়তো ভেবেছিলেন যে জাতীয় চরিত্রের এই স্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এমন দল সৃষ্টি করবেন যে ক্ষমতা ও প্রভাবে তা কংগ্রেসের প্রতি-দ্বন্দ্বী হতে পারবে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে ঐতিহ্যের শক্তি যতই প্রবল হোক, স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ জাতীয় জীবনের বুনিয়াদ পর্যন্ত নতুন করে ঢেলে তৈরী করবার প্রয়াসী। চিরাচরিত পদ্ধতি বা প্রচলিত আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, এই সহজাত উপলব্ধির ফলে অধিকাংশ চিন্তাশীল ভারতবাসী আজ সকল প্রকারের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে তাই সন্দিহান।

দলের নামকরণের অল্পদিনের মধ্যেই তীক্ষ্ণ ও গভীর-বুদ্ধি রাজাগোপালাচারী

উপলব্ধি করলেন যে এ নাম চলবে না। তাই নাম বদলে দলের নতুন নামকরণ হল স্বতন্ত্র দল। ভারতীয় জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব চিরকালই স্বীকৃত। চিরদিনই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়েছে। ভারতবর্ষে ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ খোঁজে। এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু, তাঁদের উপাসনাও মূলত ব্যক্তিগত, সমষ্টি বা গোষ্ঠিগত উপাসনার পরিচয় তাঁদের মধ্যে বিরল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রতিফলন স্পষ্ট। সমগ্র দেশের জন্য ভারতবাসীর যতখানি টান, ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায়ের প্রতি টান তার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ লোক স্বনিয়োজিত, অথবা নিজের পরিবারের কোন ব্যবসায় বা কৃষিকর্মে ব্যাপৃত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রেই সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সীমিত প্রচেষ্টাই বারবার দেখা দিয়েছে। দেশের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিসত্তার উপর এত ঝোঁক রয়েছে বলে রাজাগোপালাচারী হয়তো ভেবেছিলেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দল সহজেই ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয় জয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

একথা নিঃসন্দেহ যে রক্ষণশীল দল নামের চেয়ে স্বতন্ত্র দলের নামের আবেদন অনেক বেশী। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে স্বতন্ত্র দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেককে আকর্ষণ করেছে, একথাও মানতে হবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের যুগে স্বতন্ত্র দলের রাজনীতি বোধ হয় এদেশে সকল শ্রেণীর লোকের স্বীকৃতি লাভ করত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও বিশেষ করে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে বলে বর্তমান যুগে স্বতন্ত্র দলের সে স্বীকৃতি লাভ অসম্ভব।

পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় জনমানসের অন্য একটি শক্তিকে বিশেষভাবে জাগ্রত করেছে। প্রাচীন যুগে ভারতবাসী যখন ব্যক্তিসত্তার প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, তখনও পরিবার ও গোষ্ঠীকে সে অবহেলা করেনি। অতীতে হয়তো দেশ বা জাতির প্রতি অনুরাগ তত প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি, কিন্তু এ কথা কেবল ভারতবাসী বলে নয়, সমস্ত দেশের লোকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে বর্তমান যুগের পূর্বে কোন দেশেই জাতীয়তাবোধ প্রবল ছিল না। তাই অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সাধারণ মানুষ সেদিন দেশ বা জাতির চেয়ে গোষ্ঠী

বা পরিবারের জন্য আনুগত্য জানিয়েছে। ইয়োরোপেও দেশাত্মবোধ মধ্যযুগের শেষেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ভারতবর্ষে কিন্তু পুরাকাল থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতির সঙ্গে সম্প্রদায়-গত সম্পত্তির স্বীকৃতির পরিচয় মেলে। সাম্প্রদায়িক জীবনে ব্যক্তির কি পরিমাণ অবদান, তাই দিয়ে সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হত। মধ্যযুগের শেষে এ মনোভাব বদলাতে শুরু করল এবং বর্তমান যুগে জাতিগত একাত্মবোধ অর্থনৈতিক কারণে আরো প্রবল হয়ে উঠল। কৃষিনির্ভর সমাজে সম্পদ পরিবার বা গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই ব্যক্তির অর্থনৈতিক সম্বন্ধও সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সম্বন্ধ সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কালক্রমে বাণিজ্য ও শিল্প বিশ্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দেশের মতন ভারতবর্ষেও শিল্পায়নের ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন অনিবার্যভাবে সমাজকেন্দ্রিক জীবনে পরিণত হচ্ছে। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হয়েও রাজাগোপালাচারী তাঁর দলের নীতি নির্ধারণের সময় শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই পরি-বর্তনের মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি।

শিল্পায়নের ফলে সমাজমানসে যে পরিবর্তনের সূচনা, তা ভারতবর্ষে সীমা-বদ্ধ নয়। ব্রিটেনের মতন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ দেশে তাই রক্ষণশীল দলকে কর্ম-সূচী ও নীতির পরিবর্তন করতে হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্বীকার করেন যে ১৯৫০ সালে চার্চিল যে রক্ষণ-শীল মন্ত্রিসভা গঠন করেন, ১৯২৯ সালের র‍্যামসে ম্যাকডোনালেডের শ্রমিক মন্ত্রি-সভার তুলনায় সে মন্ত্রিসভা অনেক বেশী প্রগতিশীল। গত পঞ্চাশ বৎসরে পৃথিবীর সর্বত্র এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দল সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতীয় শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে গ্রাম থেকে শহরের দিকে জনসাধারণের আকর্ষণ বেড়েছে, অন্যদিকে যারা পূর্বে নিজের ব্যবসায়ে বা কৃষিকার্যে নিয়োজিত ছিল, তারা মাহিনার বিনিময়ে নানা ধরনের চাকুরি গ্রহণে তৎপর হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়, এবং স্বাদেশিকতার শক্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন বর্জন করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে আধুনিক যুগের শক্তিগুলি আরো প্রবল হয়ে

উঠল। শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ও সর্বোপরি রাষ্ট্র কর্তৃক নব নব কার্যভারের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অপেক্ষা জাতীয় মূল্যায়নের মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল, ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক পুঁজিপতির বদলে রাষ্ট্রশক্তিভিত্তিক নতুন শাসকশ্রেণীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিল। অতীতে যারা সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তাদের অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ায় তারা স্বভাবতই প্রতিবাদ জানাল। মূলত এই প্রতিবাদ থেকেই স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি। এই সমস্ত পরিবর্তন তাদের কাছে অপ্রিয় হলেও দেশের বিরাট জনসাধারণ তাকে সাদরে বরণ করেছে। ব্যবসায়ে শিল্প-উদ্যোগে অথবা কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে কায়েমী স্বার্থের হয়তো ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সর্ব-সাধারণের কোনই ক্ষতি হয় নি। কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের এমন কোন বিত্ত বা অধিকার ছিল না যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তারা আপত্তি করবে, বরং সহজাত অনুভূতির দ্বারা তারা উপলব্ধি করেছে যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতীয় প্রচেষ্টা ভিন্ন তাদের জীবনের বর্তমান নিম্নমান উন্নত করা অসম্ভব।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্ত্র আবাস পথ-ঘাট ও শিক্ষা স্বাস্থ্যের আজো অভাব। তাই স্বাধীনতা লাভের পরে সেই ব্যবস্থা করাই ভারতবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে আমরা যদি সেই বিপুল পরিবর্তন আনতে চাই তবে অদূর ভবিষ্যতে তা সফল হওয়ার বিশেষ আশা নেই। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে পরিবর্তন আনতে চাইলে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। তাই আজ পূর্বের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ (laissez faire) অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা চলবে না, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় জীবনকে নতুন করে সংগঠন করতে হবে। একথাও মানতে হবে যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিবর্তন আনবার তীব্র ইচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে আজ প্রকাশ পেয়েছে। পরিবার বা গোষ্ঠির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে, বর্তমানে সে প্রেরণা আরো ব্যাপক হয়ে সামগ্রিক সমাজের কল্যাণে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জনের বৃহত্তর নেতৃত্বেই এই সংগঠন পরিচালিত। কংগ্রেসের ন্যায় পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষে স্বতন্ত্র দল ভারতীয় চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দিয়েছে, আজ আংশিকভাবে

ভারতবাসীর মনোভাব পরিবর্তনের ফলে এবং আংশিকভাবে শুধু ভারতে নয় পৃথিবীময় পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে বৈশিষ্ট্য দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছে।

স্বতন্ত্র দলের নেতা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ যে সকলেই বয়সে প্রবীণ তা বোধ হয় আকস্মিক নয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বলা হয় যে প্রধানত বয়োপ্রবীণদের নেতৃত্বেই এই সংগঠন পরিচালিত। কংগ্রেসের ন্যায় পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষে এটা খানিকটা স্বাভাবিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসের প্রগতির পথে তা অন্তরায় হয়, তবে স্বতন্ত্র দলের ন্যায় এক নূতন দলের পক্ষে প্রবীণ নেতৃত্বের বোঝা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে! নেতৃবৃন্দের বয়স ছাড়াও মৌলিক আদর্শে দুর্বলতার ফলে স্বতন্ত্র দল ভবিষ্যৎমুখী নয়, অতীতের দিকেই তার দৃষ্টি, তাই তাকে অতীত যুগের দল বললে অন্যায় হবে না। তাছাড়া আদর্শের সুস্পষ্ট সংজ্ঞার অভাব এই দলটিকে আরো দুর্বল করেছে। রাজাগোপালাচারীর হয়ত সুস্পষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি অতীত মুখী, প্রগতির বদলে তাঁরা পশ্চাৎগামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। রাজাজীর সহকর্মীদের অধিকাংশেরই কোন নির্দিষ্ট সামাজিক দর্শন নেই এবং প্রায় সকলেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্তির সুস্পষ্টতা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার পটভূমিকা এত বিভিন্ন যে স্বতন্ত্র দলের সমালোচক ন্যায্যভাবেই বলতে পারেন যে দলটির কোন দার্শনিক সংহতি নেই, ফলে দলটি এতই স্বতন্ত্র যে জাতির সমস্যা সমাধানে প্রতিটি সদস্যের চিন্তাধারা ও কার্য-ক্রমে স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের সমালোচনায় রাজাগোপালাচারী প্রায়ই বলেন যে কংগ্রেসের সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক আদর্শ নেই, কেবলমাত্র জওহরলাল নেহরুর প্রতি আনুগত্যের ফলেই কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তাঁর এই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য নয় কিন্তু এই সমালোচনার উত্তরে বলা চলে যে স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি রাজাগোপালাচারীর ব্যক্তিত্ব।

আদর্শগত দুর্বলতা ও সাংগঠনিক অসংগতির ফলে স্বতন্ত্র দল এমনিতেই দুর্বল। ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে স্বতন্ত্র দলের বিলম্বিত আবির্ভাব দলের পক্ষে আরো অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল দলের পরে এসেছে বলে এই দলকে অন্যান্য সকল দলের বিরুদ্ধে নিজ দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি তরুণ নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং ইতিবাচক

মূল্যায়ণের ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ কার্যসূচী নির্ধারিত করে রঙ্গমঞ্চে নামতেন, তবে বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও দলের সাফল্যের আশা ছিল। তা হয়নি তাই স্বতন্ত্র দলের জয়ের সম্ভাবনা এমনিতেই কম। কংগ্রেসের পরিবর্তনশীলতার ফলে স্বতন্ত্র দলের ভবিষ্যৎ আরো বেশী সমস্যাময় হয়ে উঠেছে।

চার

এ পর্যন্ত যে সমস্ত দলগুলির আলোচনা করেছি, তারা সবাই ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টিকে অংশত স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতাকে তারা উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি, অংশকে সমগ্র বলে ভুল করেছে। কিন্তু এ সমস্ত দলগুলিকে যদি একত্রিত করা সম্ভব হতো, তবে তাদের সমষ্টির মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জটিলতা ও বহুমুখিতার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতো। অংশ কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, তাই এই দলগুলিও কংগ্রেসের আদর্শ ও তার দূরদর্শী নীতির বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। এবার মার্কসবাদে বিশ্বাসী যে দলের আলোচনা করব তার ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তরুণ সমাজের হৃদয় ও মন জয় করার জন্য বিশেষভাবে উদ্‌যোগী কম্যুনিস্ট দলের বিষয় প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বা ঐতিহ্যে তার ভিত্তি নেই। তার জন্ম বাইরের প্রভাবের ফলে, তার বিকাশও প্রতিপদে বিদেশ নির্ভর। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যদি অস্তিত্ব এবং সম্প্রসারণের জন্য বাইরের দিকে না তাকিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিতে দল সংগঠনের চেষ্টা করতো, তবে কম্যুনিস্ট দল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবনার বিষয় হয়ে উঠত। কম্যুনিস্টরা দাবী করে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ্বদৃষ্টি বা জীবন-দর্শন গঠনে তারা প্রয়াসী। আধুনিক যুগ একান্তভাবে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান-সম্মত বলে যা পরিচিত, তাই সাধারণভাবে সকল লোককে, বিশেষ করে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে। কম্যুনিস্ট দল তাই নিজেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী দল বলে পরিচয় দিয়ে সকলের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে।

দাবী করলেই যে তা মানতে হবে তার অবশ্য কোন যৌক্তিকতা নেই। রাজ-

সিংহাসন দাবী অনেকেই করে, তারা সকলে রাজপুত্র বা রাজা নয়। কাজেই কম্যু-নিজম যেভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী করে, তা সত্য কিনা তার বিচার করে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল : (১) বাস্তব ঘটনার উপর নির্ভরশীলতা, (২) বাস্তবের ব্যাখ্যার জন্য রচিত সূত্রের বিশ্লেষণাত্মক ও পরীক্ষা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা দেখি যে অভিজ্ঞতা যত বাড়ে, মানুষ নতুন নতুন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বদলিয়ে ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞানে তাই গোঁড়ামী বা অনমনীয় মনো-ভাবের স্থান নেই। কোন সূত্রকেই বিজ্ঞান ধ্রুবসত্য বলে মানে না। বাস্তবের প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়কে স্বীকার করে প্রচলিত মতবাদকে তাই বারবার নতুন পরীক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যদি কম্যুনিজমের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারার তুলনা করা যায়, তবে একথা মানতেই হবে যে কম্যুনিজম আর যাই হোক না কেন বৈজ্ঞানিক নয়। কম্যুনিস্টদের মতে মার্ক্সবাদ অপরিবর্তনীয়, এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই কম্যুনিজমের ধাঁচে ফেলা চলে। এ ধরনের গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস বিজ্ঞান বিরোধী। কম্যুনিজম বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ দাবী তাই একেবারে ভিত্তিহীন।

কম্যুনিস্টরা যদি মার্ক্সের প্রতিটি কথাকে বেদবাক্য বলে মানত, তবে বহুদিন পূর্বেই কম্যুনিজমের বিলুপ্তি ঘটত। মুখে যাই বলুক, কার্যত কম্যুনিস্টরা তা করেনি। এবং করেনি বলেই আজো কম্যুনিজম পৃথিবীতে শক্তিশালী। কম্যু-নিজমের যাঁরা নেতা, তাঁরা প্রত্যেকেই মার্ক্সের শিক্ষাকে বহুক্ষেত্রে লঙ্ঘন করেছেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে শিল্পে উন্নত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমেই কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাধিত হবে। কার্যত দেখা গেল যে শিল্প উদ্যোগে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রুশ দেশে যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক ও করজর্জর চাষীর সহযোগেই সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। মার্ক্সের মৌলিক অনেক নীতির সংশোধন করেই লেনিন বিপ্লবের সার্থক উদ্যোক্তারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৃষিজীবীদের মার্ক্স প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লববিরোধী শক্তিরূপে নিন্দা করেছিলেন, সেই কৃষিজীবীদের নিকটও লেনিন আবেদন জানিয়েছিলেন। কম্যুনিস্টরা লেনিনকে মার্ক্সের বিশ্বস্ত শিষ্য বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে লেনিন বহু মার্ক্সীয় নীতি বর্জন বা সংশোধন করেছিলেন। তিনি যেভাবে দলকে প্রাধান্য দিয়েছেন,

গোপন সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমকে স্বীকার করেছেন, তাতে কেউ কেউ তাঁকে মার্ক্স-বাদী না বলে ব্লাঙ্কির শিষ্য মনে করেন। বর্তমানে কম্যুনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে মার্ক্স-লেনিনবাদ বলে। এই নামকরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে লেনিন মার্ক্সের মতবাদে পরিবর্তন এনেছিলেন, তা নইলে মার্ক্সবাদের সঙ্গে লেনিনের নাম সংযোগের কোন অর্থ হয় না। পরে স্টালিন আরো পরিবর্তন আনেন বলে মতবাদের নাম হয় মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনবাদ। স্টালিনের মৃত্যু ও নেতৃত্বচ্যুতির পরে আবার পরি-বর্তন আসে এবং মতবাদ থেকে স্টালিনের নাম বাদ পড়ে যায়। স্টালিনের নামের যোগ ও বিয়োগ—দুই-ই প্রমাণ করে যে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি কখনোই অন্ধ-ভাবে মার্ক্সের মত অনুসরণ করেনি।

পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট দল সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও সার্থক কম্যুনিস্ট দল হিসাবে যে প্রমাণিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ মতবাদে পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে তারা দ্বিধা করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও সুসংগঠিত কম্যুনিস্ট দল ছিল জার্মানিতে। তারা কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি, মার্ক্সবাদের প্রতিটি ছত্র ও শব্দের প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য দেখিয়েছে। ফলে কালক্রমে সে শক্তিশালী দল ভেঙে পড়ল। স্টালিনকে অনেকে সংকীর্ণ এবং গোঁড়া মনে করেন, কিন্তু তিনিও সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ সাধনের জন্য মার্ক্সবাদের সংশোধন ও নিজের কর্মপন্থায় পরিবর্তন আনতে ইতস্ততঃ করেন নি। লেনিন অপেক্ষা তিনি আরও বেশী জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাই তাঁর আমলে সোভিয়েট রাজনীতি মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনবাদ রূপে পরিচিত ছিল। বর্তমানে যে সোভিয়েট রাজনৈতিক দর্শন থেকে স্টালিনবাদ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে বোধ হয় এই ইঙ্গিতই মেলে যে স্টালিনের আমলের তীব্র জাতীয়তাবাদের বদলে আবার লেনিনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সোভিয়েট রাষ্ট্রে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের ও জাতির কম্যুনিস্ট দল অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে সবাই মার্ক্সবাদী বলে দাবী করে, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কার্যক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ সংশোধনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা না থাকলে চীনের কম্যুনিস্ট দল কোন দিনই ক্ষমতা অর্জন করতে পারত না। বস্তুতপক্ষে গোঁড়া মার্ক্সপন্থীরা প্রথম প্রথম মাও-সে-তুংকে সাম্যবাদী বলে মানতেই চাননি, বলেছেন যে মাও-সে-তুং শ্রমিক সংগঠনের চেয়ে কৃষক সমাজের উপর বেশী নির্ভর করেন বলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল।

যেদিন শহরে শ্রমিক সংগঠনের বদলে গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠনে তিনি মন দিলেন, তখনই চীন কম্যুনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। মাও-সে-তুংয়ের এ 'অনাচার' বিজ্ঞানসম্মত মার্ক্সবাদীর মধ্যে অনেকেরই পছন্দ হয়নি। স্ট্যালিন স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন এবং প্রায় দুই দশক ধরে সংস্কারবাদী মাও-সে-তুংকে তিনি ক্ষমা করেন নি।

যুগোশ্লাভিয়াতে মার্শাল টিটো এবং পোলাণ্ডে গোমুলকা আজ দেশের অবিসম্বাদী নেতা। তাঁরাও দেশকালের প্রয়োজন অনুসারে মার্ক্সবাদের সংশোধন করেছেন, নতুন নীতি ও কর্মসূচীর সৃষ্টি করেছেন। আরও সাম্প্রতিক কালে ক্রুশ্চফ আধুনিক পৃথিবীর নতুন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও কৃষিজনিত সমস্যার ব্যাপারে এক পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের পণ্য বিক্রয়ে যে স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বহু স্টালিনপন্থীর তা পছন্দ হয়নি। কিন্তু স্টালিনপন্থীরা যাই বলুক, ক্রুশ্চফের বিজ্ঞজনোচিত দেশহিতকারী কার্যকলাপে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সন্তোষ বেড়েছে, সর্বস্তরের নরনারীর সৃজনমূলক শক্তি বৃদ্ধি হয়ে ব্যক্তির বৃহত্তর বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। কেন্দ্রীভূত একধারায় প্রবাহিত রাষ্ট্রের জীবনধারাকে বিভিন্ন কৃষিজ ও শিল্পজ কেন্দ্রের সমবায়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছেন বলে ক্রুশ্চফ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইতিহাসের এটা অমোঘ বিদ্রূপ যে, যে মাও-সে-তুংয়ের উদ্যোগে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে কম্যুনিস্ট নীতি ও কার্যের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, আজ সেই মাও-সে-তুংই মার্ক্সীয় গোঁড়ামীর এক অন্ধ অনুরাগী। অপরদিকে যে ক্রুশ্চফ প্রথম জীবনে স্টালিনের গোঁড়া অনুগামীরূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, আজ তিনি কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ও সৃষ্টিধর্মী শক্তি প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্যোক্তা।

সোভিয়েট রুশ, চীন, যুগোশ্লাভিয়া বা পোলাণ্ডের ন্যায় স্বাধীন ও মৌলিক কম্যুনিস্ট দলগুলি মার্ক্সবাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেও নীতি ও কর্মসূচীতে বহু বিপ্লবকারী পরিবর্তন এনেছে। বস্তুতপক্ষে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলেই এ সব কম্যুনিস্ট দল বারবার কর্মপন্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কম্যুনিস্টরা যতদিন রাজশক্তি দখল করেনি, মানুষের চিন্তাজগতে আসন প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা করেছে, ততদিন কম্যুনিস্ট নেতাদের বাক্য ও রচনায় স্বাধীনতার পরিচয় মেলে। ট্রট্স্কি ও লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনার সময় থেকেই কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে হয় একপক্ষে অন্ধ গোঁড়ামী, নয় অন্যপক্ষে বিচ্ছিন্ন ঘটনার অসমাপ্ত ও অসংলগ্ন গোঁজামিলের চেষ্টা বারবার দেখা দিয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহ যে গত চল্লিশ বৎসরে বিজ্ঞান শিল্প উদ্যোগে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু মূলতঃ তা রুশ জাতির নরনারীর সাহস, শ্রমশীলতা এবং আনুগত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনা করলে এই কথাই প্রমাণ হয় যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আমরা যত জোরই দিই না কেন, জাতির ভবিষ্যত প্রধানত জাতির চরিত্রের উপরই নির্ভর করে। যেখানে কম্যুনিস্ট দল স্বাধীন, সেখানে জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য তারা মার্ক্সবাদের পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে।

ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই পরমুখাপেক্ষী। এককালে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির ইঙ্গিতে চলত, বর্তমানে বহুক্ষেত্রে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির কথার পুনরাবৃত্তি করে। চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার পরে অবশ্য প্রকাশ্যভাবে চীনাপন্থী কম্যুনিস্ট বেশী মিলবে না, কিন্তু তাদের কথায়, চিন্তায় এবং কাজে এখনো মাও-সে-তুংয়ের মতবাদের আভাস স্পষ্ট। দেশের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, মতের স্বাধীনতাও নেই, ফলে যেভাবে তাদের নীতি ও কর্মপন্থা বদলায়, মার্ক্সবাদের বাঁধা বুলির যেভাবে তারা পুনরাবৃত্তি করে, তাতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে মার্ক্সবাদ আর যাই হোক, বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়, অভ্রান্ত তো নয়ই। গত ত্রিশ বৎসর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে বারবার স্ববিরোধী অস্থির মনোভাবের যে পরিচয় মেলে, মার্ক্সীয় চিন্তাধারার মৌলিক দুর্বলতা প্রমাণে তার চেয়ে আর কোন চরম সাক্ষ্য হতে পারে না।

বুর্জোয়া সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে তীব্রভাবে নিন্দা করে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু যখন তারা দেখল যে সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে তখন কম্যুনিস্ট দল কংগ্রেসের কর্মসূচী আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করেও তার মৌখিক অনুমোদন জানাল। ১৯৩০-৩১ সালে কংগ্রেসের চেয়েও অধিক জাতীয়তাবাদী হিসাবে কম্যুনিস্ট দল নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিল, ঘোষণা করেছিল যে ভারতীয় জনগণের

জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণরূপদানের পথে কংগ্রেসের বুর্জোয়া স্বার্থ প্রতিবন্ধক। কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাই ছিল কম্যুনিস্ট দলের লক্ষ্য, কিন্তু তবু মুখে তারা সব সময় যুক্ত ফ্রন্টের কথা বলত, ভাবত যে জাতীয় সংহতির নামে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কম্যুনিস্ট দল নিজেদের স্বতন্ত্র ভিত্তি স্থাপন করবে।

১৯২৩ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু প্রায় দশ বৎসরের চেষ্টার পরেও তারা বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। দেশের জাগ্রত জনমত তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব। সাধারণ বুদ্ধির লোকেও সেদিন বুঝেছিল যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। এ রকম পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর জোর দিলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হবে, তাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদেরই লাভ, তাই কম্যুনিস্ট দলের শ্রেণী-সংগ্রামের বুলি ভারতীয় মনকে সেদিন স্পর্শ করে নি। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল বিলিতী কম্যুনিস্টদের আদেশ অনুসারে চলত বলে ভারতীয় ঘটনা সমাবেশের চেয়ে ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির দিকেই বেশী তাকিয়ে থাকত। ইয়োরোপে যখন নূতন সমস্যা দেখা দিল, হিটলারের শক্তি দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল, তখন ইয়োরোপে হিটলারের প্রভাব কমাবার উদ্দেশ্যে যুক্ত ফ্রন্টের জন্য কম্যুনিস্টদের উৎসাহও বাড়তে লাগল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। তারা ব্রিটিশ ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির উপর জোর দিয়ে বলতে শুরু করল যে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হয়ে ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী শক্তির প্রতিরোধ করতে হবে।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মুখে অবশ্য তখন যুক্ত ফ্রন্টের বুলি, কিন্তু তাদের কথা ও আচরণের অসংগতির প্রমাণ এ যুগেও পদে পদে মেলে। গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি এবং তাদের অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাসের জন্য কম্যুনিস্ট দল চেষ্টার ত্রুটি করে নি। প্রায় ছয় বৎসর এ লীলা চলল। প্রকাশ্যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নিন্দাবাদ খানিকটা কমে এল, কিন্তু গোপনে গণতন্ত্র ধ্বংস করে কম্যুনিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমানভাবে চলল। কম্যুনিস্টদের এ চালবাজীও কিন্তু বেশীদিন টিকল না। গণতন্ত্রের নিম-তারিফ এবং নাৎসিবাদ ফ্যাসিজমের অবিরাম নিন্দার ফলে কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল, ১৯৩৯

সালের আগস্ট মাসে তা এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। হঠাৎ একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল দেখল যে, যে নাৎসীবাদকে তারা এতদিন মানুষের চরম আপমান বলে ধিক্কার দিয়েছে, হিটলার-স্টালিন চুক্তির ফলে হঠাৎ সেই নাৎসীবাদই গণতন্ত্রের তুলনায় কম্যুনিস্টদের কাছে বেশী আদরণীয় বলে প্রতিভাত হল। স্টালিন অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বার্থেই জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট দলের মনে তার ফলে এক বিশ্বাসের সঙ্কট দেখা দিল। কম্যুনিস্টদের কণ্ঠ আবার গণতন্ত্রের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীবাদের মধ্যে নূতন গুণ ও উৎকর্ষ খোঁজার সাধনা শুরু হ'ল। ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও বলতে শুরু করল যে হিটলারের জার্মানীর যত দোষই থাক না কেন, তার মধ্যে জাতীয় সমাজতন্ত্রের ইসারা মেলে, কাজেই কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের তুলনায় নাৎসী জার্মানী বা ফ্যাসিস্ট ইটালি শ্রেষ্ঠ।

হিটলার-স্টালিন চুক্তি প্রায় দুই বছর কার্যকরী ছিল। সে সময় রুশ-জার্মান সম্বন্ধকে মৈত্রী বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই দুই বছর ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের মধ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গেই কংগ্রেস ঘোষণা করে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্যই ভারতবর্ষের সহানুভূতি, কিন্তু ভারতের এবং অপরাপর পরাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে তদের প্রমাণ করতে হবে তারা সত্য সত্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলও কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের সমর্থন জানিয়ে ইংরাজের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের আরও কঠিন পরীক্ষা তখনও বাকী ছিল। হিটলার সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার পরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের বুদ্ধিগত বিভ্রান্তি এবং বিদেশী উপদেশের উপর নির্ভরশীলতা আরো নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। প্রায় ছয় মাস কাল ভারতীয় কম্যুনিস্টরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। সোভিয়েট রুশের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তারা যতদিন বিলিতী কম্যুনিস্ট দলের নির্দেশ পায় নি, ততদিন চুপ করে ছিল। ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালের একটি ঘটনায় ভারতীয় কম্যুনিস্টদের অবস্থা যে কি পরিমাণ হাস্যকর হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় মেলে। পাটনায় তারা এক সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন

করে কিন্তু সভাপতি যখন পেঁাছলেন তখন তিনি ভাষণহারা। কারণ বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি তাঁর ভাষণ লিখেছিলেন লাহোরে, তখনো কম্যুনিস্ট দলের পুরোনো নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থার কথাই তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর ট্রেন যখন এলাহাবাদ পেঁাছল, তখন জানতে পারলেন যে কম্যুনিস্ট কর্মপন্থার পরিবর্তন হয়েছে, এবার নাৎসীবাদ ও নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। এলাহাবাদ থেকে পাটনায় পেঁাছতে যে সময় লাগে, তার মধ্যে তিনি আর নতুন ভাষণ রচনা করতে পারেননি, কাজেই ভাষণ-হীন সভাপতি হিসাবেই তিনি সম্মেলনে উপস্থিত।

এ ধরনের ডিগবাজী থেকেই বোঝা যায় যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব কোন নীতি ছিল না। বাইরে থেকে যে হুকুম আসত তাই তারা তামিল করত। নূতন হুকুম না আসা পর্যন্ত হয় পুরেনো মতের পুনরুক্তি, অথবা ন যযৌ ন তস্থৌ ভিন্ন তাদের গতি ছিল না। বিলিতী কম্যুনিস্ট দলের হুকুম যখন মিলল, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তখন আবার সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল এবং নাৎসীবাদ হয়ে উঠল আধুনিক পৃথিবীর মূর্তিমান গ্লানি। এতদিন পর্যন্ত যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাই তখন হঠাৎ হয়ে উঠল জনযুদ্ধ।

মতের এ-ধরন আকস্মিক পরিবর্তন কেবল বিস্ময়কর নয়, হাস্যকর। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের যুদ্ধকালীন আচরণে তার হাস্যকরতা আরো নির্লজ্জ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। রাতারাতি ভারতের কম্যুনিস্ট দল ব্রিটিশ শক্তির সংগে একাত্ম হয়ে উঠল। ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতির জন্য কম্যুনিস্টদের আস্ফালন বন্ধ হয়ে গেল, বরং স্বাধীনতার দাবীতে অটল থাকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা এক অদ্ভুত অভিযোগ আনল। কম্যুনিস্টরা বলল যে, জার্মানী ও জাপানের জন্য প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি রয়েছে বলেই কংগ্রেস ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীকেও কম্যুনিস্টরা উপহাস করতে শুরু করল। কম্যুনিস্টদের চোখে দেশাত্মবোধ আবার বুর্জোয়া অপরাধ বলে পরিগণিত হল। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে এমন কথাও বলেছে যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের স্বার্থে ভারতবর্ষকে বলি দিতেও তারা প্রস্তুত। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এই একই যুদ্ধ সোভিয়েট রাষ্ট্রে মহান দেশাত্মক সংগ্রামরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

কম্যুনিস্টদের গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ যুদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ভারতে

ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তারা তখন সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। এমনকি ইংরেজের কর্মসূচীর ফলে যখন ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মন্বন্তর দেখা দিল, তখনও কম্যুনিস্ট কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যুদ্ধের অবসানে যখন আবার সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের মধ্যে মনান্তর শুরু হল, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্টদেরও সুর বদলাল। তারা আবার আবিষ্কার করল যে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিনে যাদের তারা গণতান্ত্রিক বলে অভিনন্দিত করেছিল, বাস্তবিকপক্ষে তারা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র তাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে তখন আবার কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রাম শুরু হল।

কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে নয়, পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারেও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বারবার আদর্শহীন সুবিধাবাদ ও ভারতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের পরিচয় দেয়। অধিকাংশ ভারতবাসীর মতন কম্যুনিস্টরাও প্রথমে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু তাদের মত বদলে গেল এবং কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে তারা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অজুহাতে পাকিস্তানের সমর্থন শুরু করল। যুদ্ধের আমলে কম্যুনিস্টরা যে রকম নির্লজ্জভাবে মুসলিম লীগের সমর্থন করেছে, সে কালের যে কোন সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই তা দেখা যাবে। যুদ্ধ যখন শেষ হল, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নির্ণয় করবার সময় এল, তখন কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচারকার্য চালায়। কম্যুনিস্টরা চিরকাল ধর্মপ্রবণতার নিন্দা করেছে, মার্ক্সের মতে ধর্ম আফিমের মতন জনসাধারণকে অচেতন করে রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের যে দাবী মুসলিম লীগ তুলেছিল, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে কম্যুনিস্টরা মুসলমান ভোটারদের ধর্মপ্রাণতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বিভ্রান্ত করে। ধর্মে অবিশ্বাসী কম্যুনিস্টরা সেদিন যেভাবে কোরাণের নামে মুসলিম লীগের জন্য ভোট ভিক্ষা করেছে, তা একদিকে যেমন বেদনাদায়ক তেমনি অন্যদিকে হাস্যাস্পদ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের যে শক্তিবৃদ্ধি, এবং ১৯৪৬ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগের যে জয়, কম্যুনিস্ট পার্টির 'বিরামহীন ও সংগ্রামশীল' সমর্থন না পেলে তা সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তাই মুসলিম লীগের যতখানি

দায়িত্ব, কম্যুনিস্ট পার্টির দায়িত্বও ঠিক ততখানি। লীগ তবু পাকিস্তানে বিশ্বাস করত এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের এবং ভারতীয় মুসলমানের ক্ষতি করেছে। কম্যুনিস্টদের অপরাধ আরো বেশী, কারণ তারা এ বিষয়ে জ্ঞানপাপী। ভারত বিভাগের জন্য যারা দায়ী, বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ও দুর্বল করবার অপরাধে যারা অপরাধী, তারা যখন বেরু-বারীর বিভাগ নিয়ে ছদ্মকান্না শুরু করে, তখন স্বভাবতই মনে হয় যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়াও তাদের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

জনযুদ্ধের নামে কম্যুনিস্ট দল যেভাবে ইংরেজ সরকারের প্রকাশ্য সমর্থন করে-ছিল, তাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের প্রতি কেবল বিমুখ নয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হল, ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশ থেকে বিলুপ্ত হল, তখন কম্যুনিস্টদের দুর্দশা আরো বেড়ে গেল। জনগণের সমর্থন তারা আগেই হারিয়েছিল, এবার শাসকশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও রইল না। কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা অদূরদর্শী ও চরমপন্থী, তারা তখন ভাবল যে, হিংসাত্মক উপায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে না হোক অন্তত কোন কোন অংশে হয়তো তারা ক্ষমতা লাভ করতে পারে। তাদের এ ষড়যন্ত্র-মূলক সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার জন্য স্বভাবতই তারা হায়দ্রাবাদকে বেছে নিল। নিজামের আমল থেকেই সেখানে শাসক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত বর্তমান ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে কয়েকটি আধা-সামরিক বেসরকারী সংস্থার কার্যকলাপ ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচুর অস্ত্র সরবরাহের ফলে এ সংঘর্ষ বিশেষভাবে ইন্ধনলাভ করে। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করবার আগে হায়দ্রাবাদে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাপীর ফলে হায়দ্রাবাদের গ্রাম অঞ্চলে যে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা, কম্যুনিস্টরা তার সুযোগ পুরোপুরি নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আইন ও শৃঙ্খলার অবশ্য উন্নতি হল, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় এসেছিল, তা দূর করতে সময় লাগল। তারই সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্টরা তেলেঙ্গানায় নিজেদের শাসন স্থাপন করবার চেষ্টা করে। তাদের এ দুরভিসন্ধি সার্থক হয়নি, কিন্তু তাদের কার্য-কলাপে কম্যুনিস্টদের সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমের পরিচয় দেশের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল। দেশবাসী এ কথাও জানল যে, প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে যদি ক্ষমতালাভের

আশা না থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা গুপ্ত এবং ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের দ্বারা বিভীষিকা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না।

তেলেঙ্গনার অভিজ্ঞতায় কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী, তারা বুঝল যে, ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম দিয়ে ভারতবর্ষে সাফল্যের কোন আশা নেই। তাদের মধ্যে যাদের খানিকটা দেশাত্মবোধ ছিল, দেশের স্বাধীনতার পরে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে শুরু করে যে সব ব্যাপারে সকল সময়ে বিদেশী কম্যুনিস্ট দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আত্মসম্মানের বিরোধী। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের ঘটনা বিচার ও নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করেছে, তা দেখেও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এক অংশ শিক্ষালাভ করে। তারা বোঝে যে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিবেচনা করে সংস্থাকে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে, বিদেশের অন্ধ অনুকরণ করতে গেলে ফল বহুক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ভারতীয় সংবিধানে জনসাধারণকে সার্বজনীন ভোট দেবার পরে কম্যুনিস্ট দলও শ্রেণীসংগ্রাম এবং বল প্রয়োগের নীতিকে একেবারে বিসর্জন না দিলেও অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে অন্তত সাময়িকভাবে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করে।

মার্ক্সের মতবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করবার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির অবশ্য কোন কোন বিষয়ে লাভও হয়েছে। অন্ধবিশ্বাসের ফলে একদর্শিতা আসে একথা সত্য কিন্তু তার ফলে বিশ্বাসের শক্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে এ রকম অন্ধবিশ্বাস না থাকলে ১৯৪২ সালে ভারতীয় জনমানসের বিক্ষোভে এ দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যেত। মার্ক্স বলেছিলেন যে ইতিহাসের অগ্রগতিতে কম্যুনিজমের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। মার্ক্সের কথায় অন্ধবিশ্বাসের ফলে সংকট মুহূর্তেও কম্যুনিস্টরা ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা হারায় নি। তাই ভারতীয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় কম্যুনিস্ট দল অনেক বেশী সংহত, দলের সদস্যদের নিয়মানুবর্তিতা অধিক স্পষ্ট। কম্যুনিস্টদের স্বকীয় আদর্শে নিষ্ঠা এবং সে বিষয়ে উৎসাহের ফলে ১৯৪২ সালের নির্বুদ্ধিতা এবং ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানার বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দল ভারতীয় পার্লামেন্টে তৃতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পেল। কম্যুনিস্টদের এ সাফল্য

একদিকে যেমন তাদের কর্মকুশলতার প্রমাণ, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণ যে কত সহজে অতীত ঘটনা ভুলে যায় তারও প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

স্বাধীনতা লাভের পর কিছুকালের মধ্যেই ভারত যে আন্তর্জাতিক সম্ভ্রম অর্জন করে, ভারতীয় জনগণের মনে তা এক নূতন গর্বের সঞ্চার করল। এই জাতীয় গৌরববোধ কম্যুনিস্ট দলকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, এবং সাধারণ কম্যুনিস্ট কর্মী-দের মনে গণতান্ত্রিক পন্থায় সাফল্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাস সঞ্চারিত করে। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের কেরালায় গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতালাভে আশাবাদ ও বিশ্বাসের এই মনোভাব দৃঢ়তর হল। কমুনিজমের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত যে ষড়যন্ত্র ও বলপ্রয়োগের আশ্রয় না নিয়েও কম্যুনিস্ট দল সরকার গঠন করল। অল্পদিন পরেই অমৃতসরে তাদের যে সম্মেলন হয়, সেখানে বিকাশমান উদারনৈতিক মনোভাব প্রকাশ করে সুপরিচিত অমৃতসর ঘোষণা গৃহীত হল। গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থার প্রকাশ্য ঘোষণা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম ঘটল। স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সব পরিবর্তন, তার প্রভাবেও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মতবাদে এবং কর্মপন্থায় উদারতা ও আইনানু-বর্তিতার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যদি সে সময়ে মত ও পথের বিচার করে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা করত, তবে আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে যেভাবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বেলায়ও বোধ হয় তা সম্ভব হত।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মার্ক্সবাদে অন্ধবিশ্বাস বর্জন করলেও অধিকাংশ কম্যুনিস্ট পূর্বের মত তাকে সমালোচনাহীন ও নিষ্প্রশ্ন স্বীকৃতি দিয়ে চলল। দলের স্বার্থে জনসাধারণের উপর যে নৃশংস অত্যাচার, তার ফলে কেরালায় কম্যুনিস্ট শাসনের ইতিহাস দীর্ঘকাল ভারতবাসীর কাছে এক বিভীষিকা হয়ে থাকবে। কম্যুনিস্ট চীন যেদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, সেদিন আবার নতুন করে প্রমাণ হল যে কম্যুনিস্টরা বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্লোগান আওড়ায়। অবাস্তবের পূজা ভিন্ন ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যায় ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মনোভাবের ব্যাখ্যা বাস্তবিকই অসম্ভব। কম্যুনিস্ট পণ্ডিতদের বিধানে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র কখনই আক্রমণাত্মক হতে পারে না। চীন মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী, কাজেই ভারতীয় কম্যুনিস্টরা সিদ্ধান্ত করল

যে ভারত সীমান্তে চীনের কার্যকলাপ নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ। এ হেন শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে ভারতের উপর হামলা, ভারতীয়দের বন্দী করা, তাদের প্রাণনাশ এবং অবশেষে ১৯৬২ সালে ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণ—এ সমস্তই কম্যুনিস্টদের মতে মার্ক্সীয় মায়াবাদের প্রকাশ।

বিচারবুদ্ধি একেবারে বিসর্জন না দিলে কোন ব্যক্তিই এভাবে অন্ধ সংস্কারের বন্দী হয়ে চিরকাল থাকতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রসার ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের বাস্তববোধ বেড়েছে। তার একটি প্রমাণ যে ভারত-চীন সংঘর্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মতন বাঁধা বুলি না আওড়িয়ে বাস্তবদৃষ্টিতে ঘটনার বিচার করেছেন। সোভিয়েট নেতারা প্রথমে খানিকটা দ্বিধাবোধ করলেও কোন সময়েই চীনা কম্যুনিস্টদের অহেতুক এবং বিশ্বাসঘাতক আক্রমণের সমর্থন করেননি, বরং ধীরে ধীরে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য স্বীকার করে অবশেষে প্রকাশ্যভাবে চীনের নিন্দা করেন। তার ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যেও নতুন বোধোদয়ের আভাস মেলে। সোভিয়েট ও চৈনিক মার্ক্স-পন্থীদের সাম্প্রতিক বৈষম্যের ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে বোধ হয় এই সর্ব-প্রথম নিজস্ব চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে। ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে বারবার বৈদেশিক নীতির যে অস্থিরতা, আভ্যন্তরীণ ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিচারে যে বারবার গোঁজামিল ও ভুল, তার ফলে দলের মধ্যে যারা চিন্তাশীল, তাদের মনে নতুন সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যারা বুদ্ধিমান, তারা কিভাবে দলের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির এ রকম ঘন ঘন ও আকস্মিক পরিবর্তন দেখেও কম্যুনিস্ট মতবাদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস রাখবে?

পাঁচ

কম্যুনিস্ট মতবাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা যায়, তা আকস্মিক নয়। মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্যে যে স্ববিরোধ, তা থেকেই এই সব ভিন্নমুখী বিপরীত মতবাদগুলির জন্ম। মার্ক্স বহু বিষয়ে বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহ কিন্তু তাঁর দর্শনবিচার ও দর্শনদৃষ্টি আংশিক এবং বহুক্ষেত্রে ভ্রান্ত, এ কথাও

সমান সত্য। তিনি হেগেলিয় মতবাদের বিরোধী বলে নিজের পরিচয় দিতেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি আজীবন হেগেলপন্থী ছিলেন। হেগেল বাস্তবকে দুটি বিভিন্ন বিপরীত ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে বাস্তব কখনও প্রত্যক্ষভাবে দুটি বৈপরীত্য বা বিপরীত ধর্মের মধ্যে রূপ পায় না। ইংরেজীতে বলা চলে যে বাস্তবের মধ্যে contrary বা বিরোধী সত্তার একত্র পরিচয় মেলে, কিন্তু contradictory বা বিপরীত সত্তার সহঅবস্থান সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে সত্যের প্রকাশ বহুমুখী, তাই ভারতীয় দর্শন বাস্তব জগতের বৈচিত্র্য ও আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রকাশকে সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে। হেগেল এবং হেগেলপান্থী মার্ক্স বাস্তবের এ বৈচিত্র্য স্বীকার করতে চাননি, বিপরীতধর্মী সত্তার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে বাস্তবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাই অসার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট নীতি এবং কার্যক্রমের দৌর্বল্য মার্ক্সের এই বাস্তব ব্যাখ্যার মূলগত ত্রুটি থেকেই এসেছে।

বিগত একশত বৎসরের মধ্যে মার্কসের বহু ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে হেগেলের বর্ণিত দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের ফলরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাস্তব দ্বি-শক্তির প্রকাশ, তাই তাঁর ধারণা ছিল সামাজিক উন্নতির যে কোন পর্যায়ে দুটি মাত্রই প্রধান শ্রেণী থাকবে, সামাজিক সব ব্যাপারই এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মার্ক্সের মতে তাই শ্রেণী সংঘর্ষই সমাজ পরিবর্তনের দুইটি শ্রেণীর সংঘাত সামাজিক উন্নতির একমাত্র নিয়ামকও নয়। সমাজের মধ্যে কেবল দুটি শ্রেণী বিরাজমান,—এ কথা ভেবে যত আত্মপ্রসাদই লাভ করা যায় না কেন, দুটি শ্রেণী বিরাজমান,—এ কথা ভেবে যত আত্মপ্রসাদই লাভ করা যায় না কেন, আসলে অতটা সহজে সমাজের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে সমাজে বহুশ্রেণী, এবং যাকে আমরা এক শ্রেণী মনে করি, তার মধ্যেও বহু বিভাগ। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিক শ্রেণীর কথা যদি ভাবা যায়, তাদের বিশেষ প্রকৃতি বোঝার জন্য যদি সাধারণ কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের খোঁজ করি, তবে দেখি যে শ্রমিক শ্রেণী শুধু একটিমাত্র নয়—একই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বহু বিভাগ বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই সম্পূর্ণ সমাজের শ্রেণী বিভাগের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ঠিক সেই রকম কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের আছে হয়তো বা এক একর জমি অন্য

একজনের ৫০ একর অথবা ১০০ একর বা আরও বেশী। তাদের দাবী এবং আশা তাই একমুখী নয়। কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ তাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পৃথকভাবে তীব্র সংগ্রাম করে। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংস্থা সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তাঁরা জানেন, যে সময় সময় শ্রমিক ও ধনিকের স্বার্থ সংঘাতের সমন্বয় করার চেয়েও শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন দাবীগুলিকে সাধারণভাবে পেশ করা বেশী কঠিন মনে হয়।

যতক্ষণ আমরা তত্ত্বের রাজ্যে বিচরণ করি, ততক্ষণ সমাজকে শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী আর অভিজাত সম্প্রদায় এই তিনটি শ্রেণীতে সুশৃংখল ও সুষম ভাবে ভাগ করতে পারি, কিন্তু তত্ত্ব ছেড়ে বাস্তবের সংস্পর্শে আসা মাত্র দেখি যে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রেণী বিভাগ আর বৈষম্যের অন্ত নেই। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ সম্ভ্রান্ত এবং নিম্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে যে অনাত্মীয়তার পরিচয় মেলে, অভিজাত শ্রেণীর সংগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সম্পর্কের চেয়ে তা কম নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বৈষম্য ও বিভেদ আরো তীব্র। উচ্চ মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর সংগে ক্রমাগতই আত্মীয়তা স্থাপনে প্রয়াসী, অন্যপক্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক শ্রমিক শ্রেণীর সংগে তফাৎ বজায় রাখবার জন্য সদাই সচেষ্ট। বোধ হয় এ ধরনের শ্রেণী বদলের ফলেই হিন্দু সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণ দেখা দিয়েছে এবং তারই সংগে এসেছে অস্পৃশ্যতা। বর্তমান যুগধর্মের আহ্বানে একদিকে যেমন অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়াস, অন্যদিকে তেমনি এতকাল যারা কম সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, তারাই আজ বিশেষ অধিকার এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য সংগ্রামশীল।

সামাজিক পরিবর্তন সাধনের বাহন হিসাবে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর মার্ক্স যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ইতিহাস তার সমর্থন করে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে পরিবেশের সংগে যে খাপ না খেলে জীবন সংগ্রামে জয়ের আশা নেই। তাই struggle for existence বা বাঁচবার জন্য সংগ্রাম এবং adaptation to environment বা পরিবেশের সংগে অভিযোজন সে কালে প্রায় যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তখন সবাই বলতেন যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই জীবন এগিয়ে চলে। প্রতিযোগিতার নিশ্চয়ই জীবনে স্থান আছে, কিন্তু তার ফলে সহযোগিতার মাহাত্ম্য অস্বীকার করা চলে না।

মিলেমিশে কাজ করতে জানে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর আধিপত্য করে, সামাজিক জীব হিসাবে জীবনকে সুন্দর ও সুগম করে তোলে। বস্তুতপক্ষে সমাজ জীবন সহযোগিতারই নামান্তর। অধিকাংশ প্রাণীর যে দৈহিক শক্তি অথবা গতি দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা, মানুষের তার কিছুই নেই। কিন্তু এই সব অসামর্থ্য সত্ত্বেও আজ সে সমগ্র প্রাণীকুলের অধিকর্তা। সার্থক সহযোগিতার ভিত্তিতেই জীব জগতে মানুষের প্রাধান্য। কাজেই বলা যেতে পারে যে প্রতিযোগিতা বা সংগ্রাম নয়, সহযোগিতা এবং ঐক্যবদ্ধতাই মানুষের বিরাট উন্নতির কারণ।

সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন যে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশে কার্যকরী, মার্ক্সের বিশ্লেষণের ফলে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বস্তুতপক্ষে তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি একটি বড় দান। মানুষের শক্তি সীমিত, তর আকাঙ্ক্ষা অসীম। ফলে বিজ্ঞান ও শিল্প উদ্যোগের উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। তারই ফলে অর্থনৈতিক জগতে বৈষম্য এবং সংঘর্ষ ক্রমশই অহেতুক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিহাসে বারবার দেখি যে অপরিহার্যভাবেই একজনকে বঞ্চিত করে অন্যজনের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। মার্ক্স এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে বিপরীত দাবীর এই সংঘর্ষই ব্যক্তির এবং সমাজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্ক্সের এ আবিষ্কার বিপ্লবকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন আবিষ্কারের আনন্দ তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে চরমে টেনে নিলেন। এমন সব মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করলেন যে ইতিহাসের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তা গ্রহণ করতে পারে না। ঐতিহাসিক জড়বাদ এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে তিনি প্রকৃতির শাশ্বত সত্ত্বা এবং অমোঘ বিধান বলে ভুল করলেন। ফলে তাঁর মূল বক্তব্য এমন কতকগুলি অনড় সংস্কারে পরিণত হল যে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় তাঁদের তত্ত্বের সমর্থনের জন্য বাস্তব ঘটনার উপরও হস্তক্ষেপ করেছেন। তাঁরা কেবল মাত্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যই যে এই নীতি প্রয়োগ করেছেন তা নয়, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শকে এই নীতিদ্বারা সমর্থনে প্রয়াসী হয়েছেন। গোঁড়া মার্ক্সবাদীর মতে চিত্র বা কবিতার মূল্যায়ণ অথবা শিল্পী বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার বিচার করবার জন্যও তাদের শ্রেণী সম্বন্ধের কথা জানা প্রয়োজন। মার্ক্সবাদী সমালোচক তাই শেক্সপীয়রকে

ব্রিটেনের বুর্জোয়া বিপ্লবের এবং রবীন্দ্রনাথকে ভারতের ধনতন্ত্রের প্রসারের সাহিত্যিক হিসাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অর্থনীতির ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, মানুষের বৃত্তি, তার সমগ্র অভ্যাস, এমন কি চিন্তাধারার উপরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। কৃষিজীবী সম্প্রদায় সাধারণত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক রক্ষণশীল। অর্থনীতি মানুষের কথা, কাজ ও চিন্তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে সমস্ত মানবিক ক্রিয়াপদ্ধতি অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ কথা বললে সত্যের অপলাপ ঘটে। অর্থনীতি আদর্শবাদকে যতখানি প্রভাবান্বিত করে, আদর্শবাদও অর্থনীতির উপর ততখানি প্রভাব বিস্তার করে। মার্ক্স নিজেই এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিরকাল দারিদ্র্য যাতনা সহ্য করেও তাঁর আদর্শ বিচ্যুতি ঘটেনি, তীব্র অর্থনৈতিক টানা পোড়েনের মধ্যেও তাঁর আদর্শবাদ সব কিছুর উপর জয়লাভ করেছিল। কম্যুনিস্ট দলের তরুণ কর্মীকেও আদর্শবাদই অনুপ্রাণিত করে—তাই মুখে কম্যুনিস্ট কর্মী যাই বলুক না কেন, তার আচরণ তার মার্ক্সীয় মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

বহু মার্ক্সবাদীর পক্ষে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা এবং শ্রেণী সংঘর্ষের বাস্তবতা প্রায় ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সংঘর্ষকে যারা বাস্তবের প্রকৃতি মনে করে, তারা যে বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক আচরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার উপর এত অধিকমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছে যে সমাজে সংক্ষুব্ধ সংঘর্ষ অবধারিত ভাবেই দেখা দিয়েছে। কম্যু-নিস্টরা সমাজ পুনর্গঠনের জন্য হিংসা এবং বিদ্বেষকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি বিপ্লব-সংঘটনকারী যন্ত্র হিসাবে হিংসামূলক কার্যে রত হয়, তাহলে ধর্ম বা নীতি বোধের বিরোধী হলেও তার কার্যাবলীকে কম্যুনিস্টরা নিন্দার বদলে প্রশংসার যোগ্য মনে করে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শক্তি এবং বিদ্বেষের ব্যবহারকে মার্ক্সবাদী দার্শনিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ পদার্থের উন্নততর প্রকাশমাত্র। মানুষ ও প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে পার্থক্য তাদের চোখে শুধু উপাদানের সংখ্যা ও জটিলতার উপর নির্ভর করে। পদার্থ জগতের বিচারে জড় পদার্থ ও

সজীব পদার্থের আচরণ একই সূত্র দিয়ে বোঝা যায়। ছাদের উপর থেকে একখন্ড পাথর ফেলে দিলে তা যেভাবে প্রবলবেগে ভূমিতে পড়বে, একজন মানুষকে ফেলে দিলেও ঠিক তাই হবে। মার্ক্সবাদী তাই মনে করে যে সজীব পদার্থ বলতে মানুষ এবং সমস্ত প্রাণী বোঝায় বলে জড় জগতের নিয়ম বা সূত্র উভয়ের উপর সমান প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে জড় জগতের আইন কিন্তু চিন্তা বা ভাব জগতে খাটেনা, তাই বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শে মানুষের বিবেকসম্পন্ন বিচার ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশ, জড় জগতের নিয়ম কানুন দিয়ে তা বোঝাতে চাইলে হাস্যস্পদ হতে হয়। চিন্তা ও ভাবজগতে এই স্বকীয়তাই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং মার্ক্সবাদে সে স্বকীয়তার স্বীকৃতি নেই বলেই মার্ক্সবাদী মানুষের মানবোচিত চিন্তা ও কর্মের কোন বিবরণ দিতে পারে না।

মার্ক্সের মতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বস্তুগত প্রয়োজনের স্বীকৃতি মাত্র। মার্ক্সের মতামত সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা এ কথাও মানবেন যে প্রকাশ্যে মার্ক্স যতই প্রতিবাদ করুন না কেন, আসলে কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অদৃষ্টবাদী। পূর্বেই বলেছি যে এ ধরনের অন্ধবিশ্বাস মার্ক্সবাদীর জন্য শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্সবাদী মনে করে যে, সে এমন কাজের জন্য সংগ্রাম করছে যার সাফল্য অনিবার্য এবং প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্ট। তাই মার্ক্সবাদীর বিশ্বাসের শক্তি বুদ্ধি এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষ, অথচ ইচ্ছাশক্তি আর বুদ্ধিই মানুষের একান্ত গৌরবের সামগ্রী।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সংস্কারের পরিবর্তে বিপ্লবকে মার্ক্স কেন বেছে নিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর মতে মানুষ অনুভূতিহীন বিচার-বিবেক-বর্জিত জড় পদার্থের জটিলতর প্রকাশ, কাজেই জড় জগতে বাহিরের শক্তি সংঘাতে যে ভাবে পরিবর্তন আসে, সমাজ জগতেও ঠিক সেইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সংঘর্ষেই প্রগতি আসবে। বিবেক সম্পন্ন লোক কিন্তু বলবেন যে, ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আসাই বাঞ্ছনীয়। গোঁড়া মার্ক্সবাদীরা বলবে যারা সংস্কার পন্থী, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল, তাই সংস্কারধর্মী মনোবৃত্তি শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, প্রগতি বিরোধী। সত্যি কথা বলতে কিন্তু মার্ক্সীয় পদ্ধতির বিচারে ভাল বা মন্দের কোন অর্থ নেই। মার্ক্সবাদীদের বিশ্বাস যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় আপেক্ষিকভাবে সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হয়। যদি কোন জিনিসকে অনিবার্য মনে করি, তবে তাকে ভাল বা মন্দ বলার কোন অর্থ হয় না। প্রকৃতির নিয়মে যা ঘটবেই, তা নৈসর্গিক,

কাজেই ভালোমন্দের প্রত্যয় সেখানে নিরর্থক। মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করি বলেই মানুষের কাজকে ভাল বা মন্দ বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মানুষই ভাল মন্দের বিচার করবার ক্ষমতা রাখে। মানবধর্মী মার্ক্স সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের কথা চিন্তা করে নিজে আজীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর এই আচরণের দ্বারাই প্রমাণ হয় যে বস্তুবাদ অপেক্ষা মানবিক বৃত্তি তাঁর জীবনে অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে নিজে আদর্শবাদী হয়েও ঐতিহাসিক জড়বাদের উপর বেশী জোর দেওয়ার ফলে মার্ক্স মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কালের অমোঘ বিধানে সামান্যতম অণুপরমাণু থেকে মনুষ্যকুল পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর মতে অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘকালের পরিক্রমে ব্যক্তির পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনই সত্য এবং ব্যক্তির সত্তার কোন মূল্য নেই—মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় এই সব ভাবনা হঠাৎ প্রবেশ করে নি। মার্ক্সবাদী উপায়কে অবহেলা করে লক্ষ্যের উপর এত বেশী জোর দেয় কেন তাও এ থেকে বোঝা যায়। ঐতিহাসিক বিবর্তনে যদি ফললাভ ঘটে, তবে মার্ক্সবাদী লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মোটেই ভাবে না। বস্তুতান্ত্রিক দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির প্রতি অবহেলা এবং সমষ্টির পূজা মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় তাই অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক দ্বৈতবাদকে স্বীকার করলে যে লক্ষ্য বা আদর্শের কোন অর্থই থাকে না, সেকথা মার্ক্স ভুলে গিয়েছেন।

দার্শনিক চিন্তাধারার দুর্বলতার ফলে মার্ক্সবাদীর বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে নানা অসংগতি এসেছ। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক বিবর্তনকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছে, কিন্তু মার্ক্সসীয় দর্শনে বিশ্বাস করলে ঐতিহাসিক বিবর্তনের অবসান অনিবার্য। মার্ক্সবাদ বিপ্লবকে মনে করেছে ফললাভের একমাত্র উপায়, বলেছে যে শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমেই পরিবর্তন আসবে অথচ মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে এক সময় শ্রেণী বিভাগের সমস্ত বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। স্বভাবতই তখন সংঘর্ষেরও অবসান ঘটবে, কিন্তু তার সংগেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাও লুপ্ত হবে। পরিণামে তাই অনড় স্থানু সমাজের সৃষ্টি হবে। জীবনের অর্থ কিন্তু পরিবর্তন, তাই পরিবর্তনহীন সমাজের মধ্যে আর জীবনের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মার্ক্সীয় মতবাদের এ ধরনের স্ববিরোধের পরিচয় ব্যক্তির স্বকীয় বিশ্বাসের মধ্যেও

মেলে। মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই মার্ক্স অর্থনীতি এবং সমাজনীতি অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কার্যসূচীতে মানুষের ব্যক্তিগত সব সুখকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সমষ্টিগত স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যক্তির বিনাশ কম্যুনিজমের অবশ্যম্ভাবী ফল। লক্ষ্য সাধনকেই মার্ক্স চরম সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু কার্যত মার্ক্সীয় কর্মপন্থায় লক্ষ্য এবং উপায় দুই অস্বীকৃত হয়েছে। মার্ক্সবাদের পরিণতিতে তাই মার্ক্সবাদের প্রত্যেকটি বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তই বর্জন করতে হয়।

॥ ছয় ॥

মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে এবার কংগ্রেসের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করলে এই কথাই প্রথম স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে কংগ্রেস অর্থনীতির গুরুত্ব স্বীকার করে, কিন্তু অর্থনীতিকে মানব সমাজের একমাত্র নিয়ামক বলে মানে না। গান্ধী বলেছিলেন যে ক্ষুধিত মানুষের কাছে ভগবানও রুটির রূপে দেখা দেন। তাঁর বক্তব্য থেকেই মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের উপর কংগ্রেস যে কি জোর দিয়েছে তা বোঝা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস স্বীকার করেছে যে বাঁচবার প্রাথমিক চাহিদা মেটবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার অনেক উপরের কোন এক আদর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। বৃহত্তর জীবনের জন্য এ আকুতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কসের নামও স্মরণীয়। অর্থনৈতিক দাবীর প্রাধান্যের বিষয়ে তিনি অনেক কিছু বলেছেন, নিজের জীবনে কিন্তু সে দাবীকে তিনি কোনদিন আমল দেন নাই।

শুরু থেকেই কংগ্রেস তাই জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলি যাতে অবলুপ্ত না হয় সে বিষয়ে কংগ্রেস সমান সচেতন থেকেছে। মানুষের পরিমিত ক্ষমতা এবং তার অপরিমিত চাহিদার অসামঞ্জস্য থেকে অর্থনৈতিক সব সমস্যার উদ্ভব। শুধু অর্থনৈতিক দাবীর দিকেই যদি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে মানুষের ক্ষমতা এবং চাহিদার মধ্যে কোনদিনই সামঞ্জস্য আসবে না। এ কথা সত্য যে আজ আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে আমাদের জৈবিক প্রয়োজনের সমস্ত দাবীই আমরা মেটাতে

পারি। কাজেই অভাবের ভিত্তিতে অর্থনীতির যে রূপায়নকে আমরা একদিন নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছি, ভবিষ্যতে হয়তো তার পরিবর্জন ও পরিমার্জন হবে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যে সর্বদাই কম হবে, এই মূলগত ধারনার পরিবর্তন সম্ভব হবে মনে হয় না। আহার্য পানীয় আবাস যানবাহনের মতন বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসম্ভার অথবা শিক্ষা চিকিৎসা বেকার বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুখ-সুবিধা যতই বাড়ুক না কেন, মানুষ সর্বদাই আরো বেশী করে সব কিছু চাইবে, তার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই অতৃপ্ত থেকে যাবে।

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে যদি নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তবে সমাজ যতই ঐশ্বর্যশালী হোক না কেন, সকলের ভাগ্যে সমান সুযোগ সুবিধা মিলবে না, শক্তিশালী দুর্বলকে বঞ্চিত করে নিজের ভোগ বাড়াবার চেষ্টা করবে। কংগ্রেস মতবাদ তাই একদিকে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদার পূরণ ও অন্যদিকে মানুষের অফুরন্ত দাবীকে সংযমের বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেছে। আজ বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে বহু রোগব্যাধিকে মানুষ আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। পুরাকালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে যেভাবে লোকক্ষয় হয়েছে, আজ মানুষ তা সহ্য করবে না। ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ যে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে ইতিহাসে তার নজীর মেলে না। এই পরিস্থিতিতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা। দাবীর পরিতৃপ্তি ও আত্মসংযমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে আদর্শ কংগ্রেস ভারতবর্ষের সম্মুখে স্থাপন করেছে, আজ সমস্ত পৃথিবীর জন্য তা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণীসংঘর্ষের যে সূত্রীকরণ, তাকে অর্ধসত্য বললে অন্যায় হবে না। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থ সংঘাত রয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে সমাজকে দুইটি সুসংবন্ধ ও সংহত শ্রেণীর সংগ্রাম ক্ষেত্র মনে করলে ভুল হবে। বস্তুতপক্ষে শ্রেণীর সংগঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে যাকে মার্কস শ্রমিকশ্রেণী বলেছেন, বস্তুতপক্ষে তা একটি শ্রেণী নয়, বরং বহু শ্রেণীর সমষ্টি। সমাজে যাদের শ্রমিক বলা চলে, তার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণী এত বেশী যে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এক যোগে কোন দাবী করা বহুক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। বড় বড় রাজনৈতিক দাবীর ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণী মিলতে পারে, এবং মেলে, কিন্তু অর্থনৈতিক দাবীর ক্ষেত্রে সে ধরনের মিল আরো কঠিন। শ্রমিক আন্দোলন বা

ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে বেতন বৃদ্ধির দাবীতেও সমস্ত শ্রমিক সর্বদা মিলতে পারে না। মালিকের কাছে সবাই অধিক বেতন বা মজুরী দাবী করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে যে শ্রমিক দশটাকা বেশী মজুরী পায়, সে চায় যে পরিবর্তিত ব্যবস্থায়ও তার মজুরী বেশী থাক। একথা বল্লে তাই অন্যায় হবে না যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার যতখানি পরিচয় মেলে, প্রতিযোগিতার পীরিচয়ও ঠিক ততখানিই মেলে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা, সংযোগ ও বিরোধ, এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই সমাজ গড়ে উঠে।

ঐতিহাসিক বিচারে এ কথাও প্রমাণ হয় যে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতারই মাধ্যমেই মানবসমাজের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হয়েছে। সহযোগিতা ভিন্ন আদিম-কালের মানুষ বাঁচতেই পারত না। পরস্পরকে সাহায্য করেই মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে দমন করেছে, অন্যান্য জীবজন্তুর উপর প্রাধান্য স্থাপন করেছে। বর্তমানেও বহু দেশের বহু জাতির বহু মানুষের সহযোগিতার ফলেই বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব। সংঘাত বা সংঘর্ষের চেয়ে কংগ্রেস যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা তাই সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। মার্কসীয় দর্শনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য সর্বদাই বিবদমান ও সংগ্রামলিপ্ত। ফলে হিংসাবিভক্ত সমাজের যে স্বরূপ মার্কসবাদীর বিবরণে মেলে, তার তুলনায় মানবিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বজন কল্যাণসূচক যে সমাজ আদর্শ কংগ্রেস গ্রহণ করেছে, তাই অনেক বেশী বাস্তব। বাস্তব বিচারে ও আদর্শের মহত্ত্ব বিচারে, উভয়ভাবেই তাই কংগ্রেসী জীবনদর্শন মানুষের গ্রহণীয়।

কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট মতবাদের মধ্যে যেখানে মূলগত এতবড় পার্থক্য, সেখানে যে তাদের নীতি, পদ্ধতি ও কর্মসূচির মধ্যে প্রতিপদে বিরোধ দেখা দেবে, সে কথা বলা বাহুল্য। কম্যুনিস্ট দেশগুলির মতন ভারতবর্ষও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে, কিন্তু কংগ্রেসী ও কম্যুনিস্ট পরিকল্পনার প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কম্যুনিস্ট মতবাদে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা নাই, সম্প্রদায়ের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। কাজেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রয়োজনে যদি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ধনমানপ্রাণ উৎসর্গ করতে হয়, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে যে বৃহদায়তন

শিল্পের উন্নতির উপর অধিক জোর দেওয়া হয় এবং গ্রামগুলিকে বঞ্চিত করেও শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। শ্রমিকের একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপ যে মতবাদের ভিত্তি, সেখানে শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য কৃষককে মূল্য দিতে হবেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষকে স্বভাবের নিয়ম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে বলে মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। তার ফলে স্বভাবতঃই বৃহত্তর শিল্পসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, তাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। গত ৪০ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে বৃহদায়তন শিল্পের বিস্ময়কর প্রগতি হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ যা চায় সে সব জিনিস, বিশেষ করে খাদ্যবস্ত্রের উৎপাদন বা আবাসগৃহ নির্মাণ শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি, বরং কোন কোন বিষয়ে পূর্ব অবস্থার অবনতি ঘটেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কক্ষপথে লুনিক স্থাপনে বা মহাশূন্য থেকে জাহাজ ফিরিয়ে আনার সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছ, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য মাংস, দুধ, জামা কাপড় বাসস্থান, ইত্যাদির সংস্থান আজো পুরোপুরি করতে পারে নি। স্টালিনের আমলে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনীতি জনসাধারণের এ সমস্ত দাবী মানতেই চায়নি, ক্রুশ্চভ সে দাবী মেটাবার চেষ্টা করেছেন বলেই আজ সোভিয়েট জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়, কাজেই স্বভাবতঃই জনসাধারণ পূর্বের তুলনায় বেশী সুখ-সুবিধা আশা করে। উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার যদি সবটাই সাম্প্রতিক ব্যবহারে লাগানো যায়, তবে সামাজিক মূলধন তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে না, তাই সমাজের মূলধন দ্রুতগতিতে পরিবর্ধনের জন্য সোভিয়েট পরিকল্পনা সঞ্চয়ের উপর বেশী জোর দেয়, উপভোগকে বিলাস বলে বর্জন করতে চায়। প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে জনসাধারণের এবং বিশেষ করে কৃষকসমাজের জীবনের মানের যতখানি উৎকর্ষ সম্ভব, সজ্ঞানে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে দ্রুততর গতিতে সামাজিক মূলধন বর্ধন তাই কম্যুনিস্ট পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় ত্রিশ বৎসর সোভিয়েট নাগরিক তার পরিশ্রম ও শিল্প-কৌশলের ফল ভোগ থেকে তাই বঞ্চিত ছিল, রাষ্ট্রনায়কদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যা ঘটেছিল, বর্তমানে

কম্যুনিস্ট চীনে আরো কঠিনভাবে তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। মাও-সে তুং-এর সঙ্গে ক্রুশ্চভের প্রধান প্রভেদ এই যে, দেশকে শক্তিশালী করা ক্রুশ্চভেরও লক্ষ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোভিয়েট নাগরিকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে তার জীবনের মান উন্নত করবার চেষ্টা করছেন।

সমাজের প্রগতির জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও সঞ্চয়ের প্রয়োজন। আজ যা উপভোগ করতে পারি, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় তাকে বর্জন করাই সঞ্চয়ের অর্থ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু বর্তমানকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলে চলে না। তাই উৎপাদনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তার খানিক অংশ বর্তমান উপভোগ ও খানিক অংশ ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। কম্যুনিস্ট পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাহ্য করে বলে বর্তমানের এসব দাবী অনায়াসে বাতিল করে। একনায়কত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নাই, রাষ্ট্র প্রয়োজন মত পুলিশী ব্যবস্থা করে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখে, জোর করে জীবিকার মান অবনত রেখে শিল্প বিকাশের মূলধনের ব্যবস্থা করে। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তি তাই এসব দাবী পেশ করবারও সুযোগ পায় না। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রশক্তির অংশীদার, তাই জীবিকার মান উন্নত করতে হবে, এ দাবী অস্বীকার করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব নয়। ক্রুশ্চভ সে দাবী অংশত স্বীকার করেছেন, এবং সাধারণ নাগরিকের খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহের দাবী অনেকাংশে মিটেছে। তার ফলে কম্যুনিস্ট পরিকল্পনার প্রকৃতি ও লক্ষ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, সেজন্য ক্রুশ্চভ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ভারতীয় পরিকল্পনা প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই একদিকে ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও অন্যদিকে বর্তমানের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা তার প্রত্যেক স্তরে স্পষ্ট। বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে না পারলে সমাজের প্রগতি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হবে না, এবং বৃহৎ শিল্প গড়ার জন্য মূলধন সঞ্চয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই ভারতীয় পরিকল্পনা সাম্প্রতিক সম্পদের একটা মোটা অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার ব্যবস্থা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পরিকল্পনা একথাও স্বীকার করে নিয়েছে যে, বর্তমানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে স্তরে রয়েছে, তার আশু উন্নতি করতে না পারলে কেবল ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগ দেশ নির্মাণের সাধনায় পুরোপুরি লাগানো যাবে না। ভারতীয় পরিকল্পনা তাই একদিকে প্রধানত রাষ্ট্রীয়

তত্ত্বাবধানে বৃহদায়তন শিল্পগঠন ও অন্যদিকে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যাপকতর ব্যবস্থা করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। সে পরিকল্পনার একদিকে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ধরনের শক্তির ব্যবহারে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী করবার প্রয়াস। এক কথায় জনসাধারণের সাম্প্রতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি—এই দুই উদ্দেশ্যকে যুগপৎ সার্থক করাই কংগ্রেস কার্যক্রমের লক্ষ্য।

কংগ্রেস মতবাদই ভারতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি। তাই অনগ্রসর অঞ্চল ও সম্প্রদায়গুলির উন্নতির জন্য সে পরিকল্পনায় বিশেষ আগ্রহের পরিচয় মেলে। নগরবাসী যেভাবে নিজেদের দাবী পেশ করতে পারে, গ্রামাঞ্চলের লোক সাধারণত তা পারে না। তাই অতীতে গ্রামবাসী সমাজের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভারতীয় পরিকল্পনায় গ্রামবাসী এবং নগরবাসীর প্রয়োজনের সমন্বয় সাধন করে সকল শ্রেণীর লোকের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের জন্য একটি সুসংহত ও সুসমঞ্জস কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ লাভের চেষ্টা সুস্পষ্ট। পরিকল্পনার মতন জটিল ব্যাপারে সর্বদাই মতভেদের অবকাশ থাকে, তাই ভারতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, উদ্যোগ, শিক্ষা বা শিল্পের যে পারস্পরিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু ভারতীয় পরিকল্পনায় যে ব্যাপক ও সংহত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে, তার তুলনা নাই এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিরোধের মধ্যে ঐক্যসাধন করাই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতে কংগ্রেস নিজের কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে, তাই বৃহত্তর জনসাধারণের সম্মতিক্রমে তাদের জীবনের মান উন্নত করবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিচালনার সঙ্গে জনতার সহযোগের সমন্বয় সাধনই ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য।

হেগেলীয় দর্শনের ভিত্তিতেই মার্কসের মতবাদ ও কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল। দার্শনিক হিসাবে হেগেলের মর্যাদা অনস্বীকার্য কিন্তু বৈপরিত্যের ভিত্তিতে তিনি সত্তার যে বিবরণ দিতে চেয়েছিলেন, তার ফলে আধুনিক ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার অনেকগুলি ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি এসেছিল, সে কথাও সমান অনস্বীকার্য। হেগেল বলেছিলেন যে, প্রত্যেক গুণ বা লক্ষণের মধ্যেই তার বিপরীত লক্ষণ বা গুণ নিহিত।

তাই যে কোন লক্ষণ বা গুণের প্রকাশে অনিবার্যভাবে তার বিপরীত গুণ বা লক্ষণ প্রকাশিত হবে। বিপরীত ধর্মী দুই সত্ত্বার দ্বন্দ্বের ফলে তাদের উভয়ের লক্ষণ-সমন্বিত নূতন এক সত্ত্বার আবির্ভাব হয়। কালক্রমে এই নূতন সত্ত্বাও তার বিপরীত সত্ত্বাকে আহ্বান করে এবং তাদের দ্বন্দ্বের ফলে আবার নূতন সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিধমীতা ও দ্বৈতপ্রকাশের মাধ্যমে এভাবে সত্ত্বার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা সহজেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়, এবং মার্কস নিসংশয়ে হেগেলের এ মতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবকে কিন্তু এত সহজে কোন সূত্রের মধ্যে বাঁধা যায় না, তাই বলা চলে যে, হেগেলের বিবরণ যতই সরল ও গ্রহণযোগ্য মনে হোক না কেন, তাকে শেষ পর্যন্ত ভুল না বলে উপায় নাই। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় দর্শন সত্ত্বার বিবরণে যে অনন্ত বৈচিত্র্য ও বৈপরিত্যের সমাবেশ দেখেছে, তাতেই সত্ত্বার প্রকৃত পরিচয় মেলে। সত্ত্বা বহুমুখী, কেবলমাত্র দ্বিমুখী নয় একথা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংঘর্ষবাদের দার্শনিক ভিত্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

অভিজ্ঞতার অনন্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করার ফলে কংগ্রেস মতবাদে বাস্তবের যে পরিচয় মেলে, মার্কসীয় দর্শনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে সে পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই। ইতিহাসকে ভিত্তি করে মার্কস নিজের মতবাদ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রেণী-সংঘর্ষের যে সূত্রকে অপ্রশ্নভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তা যে ইতিহাস-বিরোধী একথা তিনি বুঝতে পারেন নি। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সংঘাতের ফলে কখনো কখনো উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি বা মহত্তর সমাজচিন্তা স্বীকৃতিলাভ করেছে, ইতিহাসে হয়তো তার নজীর মেলে, কিন্তু উন্নতি কেবলমাত্র সংঘাতের পথে আসে, ইতিহাসে একথার সাক্ষ্য মেলে না। বরং ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোন কোন সম্প্রদায় অনগ্রসর কিন্তু সামরিক শক্তিতে বলশালী সম্প্রদায়ের হাতে পরাজিত হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার তুলনায় আর্যসভ্যতা অপরিণত, কিন্তু সংগ্রামে আর্যরাই জয়লাভ করেছিল, হরপ্পাবাসী পরাজিত হয়। ঠিক সেইভাবে গলদের হাতে রোমানরা পরাজিত হয়, কিন্তু সভ্যতার বিচারে রোমবাসী সেদিন জগতে অগ্রগামী বললেও খুব অত্যুক্তি করলেই সংঘর্ষভিত্তিক মার্কসীয় মতবাদের অপ্রামাণিকতা পরিষ্কার ধরা দেয়। সহযোগিতার মাধ্যমেই শারীরিক শক্তিতে দুর্বল মানুষ সমস্ত জীবজন্তুর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। মানবসমাজে ব্যক্তির জীবনেও আমরা সেই একই সত্যেরই

প্রকাশ দেখি। হিংসা ও বিদ্বেষের পথে নয়, সহযোগের দ্বারাই ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্ব লাভ করে।

সহযোগই মানুষের উন্নতির ভিত্তি একথা স্বীকার করলে অহিংস মনোবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধিকে সামাজিক সম্বন্ধের প্রকৃত প্রকাশ বলে মানতেই হবে। বস্তুতপক্ষে অন্যান্য জন্তুর কার্যক্রমের সঙ্গে মানবিক কার্যক্রমের প্রধান বিভেদ এইখানে। অন্যান্য সকল প্রাণীই শক্তির দ্বারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়, একমাত্র মানুষ শক্তির বদলে যুক্তির প্রয়োগ করে অন্যকে নিজের মতাবলম্বী করবার চেষ্টা করে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে স্বার্থসংঘাত হলে সংঘর্ষ ভিন্ন তার সমাধান অসম্ভব। মানুষের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ হলেও আলাপ-আলোচনার দ্বারা তার আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা বহুক্ষেত্রেই সফল হয়। সমন্বয়ের এই প্রচেষ্টাকে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য দর্শনের মর্যাদা দিয়েছে। কংগ্রেসও তাই অহিংস উপায়ে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমাজ সংস্কারের আদর্শকে গ্রহণ করে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করে নিয়েছে। মার্কসবাদের যে কর্মপদ্ধতি, তার তুলনায় কংগ্রেস-কর্মপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তাই বাস্তব অভিজ্ঞতায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তি দিয়েও কংগ্রেস মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়। দর্শনবিচারে অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা-পাঠে যাঁরা আগ্রহী, আমার Science, Democracy and Islam বইখানিতে তাঁরা তার যুক্তিনিষ্ঠ বিবরণ পাবেন।

॥ সাত ॥

কংগ্রেস এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত এ বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসের যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেখানে কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কোন দল দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শ শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত জগতের জন্য আজকের দিনে বিশেষ উপযোগী। গত তিনশো বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে ৫টি বড় রকমের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ১৬৪০ খৃস্টাব্দে যে ব্রিটিশ বিপ্লব শুরু হয়, রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ডে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার বিপ্লব, এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও পরে সামাজিক সাম্যের দাবী মুখরিত হয়ে উঠে। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে যে বিপ্লব, তাতে অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিপ্লব পূর্বের সমস্ত বিপ্লবগুলিকে সম্পূর্ণ করে।

বস্তুতপক্ষে এই পাঁচটি বিপ্লবকে একটি অবিচ্ছিন্ন সামাজিক বিবর্তনের ধারা মনে করা উচিত। ব্রিটিশ বিপ্লব দায়িত্বহীন রাজার বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আমেরিকার বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দাবী। ফরাসী বিপ্লব এ দুটি ধারণা ছাড়াও সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করেছে। অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে যুক্ত করে রুশিয়ার বিপ্লব এই ধারণাকে ব্যাপকতর রূপ দেবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের বিপ্লবে এই সমস্ত আদর্শ স্বীকার করে তার সঙ্গে যুক্ত করেছে নতুন কর্মপদ্ধতি। উপায়কে বাদ দিয়ে লক্ষ্যের বিচার করা যায় না, ভারতীয় বিপ্লবের এই হল প্রধান শিক্ষা। কম্যুনিস্ট দলের চীনে ক্ষমতাগ্রহণ এই পাঁচটি বিপ্লব থেকে পৃথক। সংঘর্ষের পথে মাও-সে-তুং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন, কিন্তু তবু তাকে প্রকৃতপক্ষে নতুন বিপ্লব বলা চলে না। লেনিন মার্ক্সবাদের যে সূত্র রুশদেশে প্রয়োগ করেছিলেন, চীনদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার খানিকটা বদল করে মাও-সে-তুং যে ভাবে দেশ অধিকার করেন, তাতে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোন নতুন ধারণা সংযোজিত হয় নি।

এই পাঁচটি বিপ্লবের মধ্যে পূর্ববর্তী চারিটিতে উপায়ের চাইতে লক্ষ্যের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বেশী। বৃটিশ বিপ্লবে নাগরিক স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এই বিপ্লব কুড়ি বৎসর অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে প্রকাশ্য অকৃতকার্যতায় পরিণত হয়। রাজার প্রাণদণ্ডের ফলে বিপরীতধর্মী শক্তিগুলি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল বলে বৃটিশ বিপ্লবের সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। আমেরিকার বিপ্লবের মধ্যেও সহিংস কার্যক্রমের লক্ষণ মেলে, কিন্তু তাকে আমেরিকার বিপ্লবীরা বিপ্লবের অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করেনি। তবু সহিংস পন্থা অবলম্বনের জন্য প্রায় একশত বৎসর আমেরিকা এবং বৃটেনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই প্রায় বার হাজার রাজভক্ত প্রজা এই নতুন রাজনৈতিক প্রবর্তনা গ্রহণ করার চেয়ে দেশত্যাগ করা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। এদের সংখ্যা কম হলেও তাদের যে মনোভাব, তারই

ফলে বহুকাল ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং সংঘাতের পরিচয় মেলে।

ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী সমস্ত মানুষের মনকে অভিভূত করে তুলেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তাই সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু আদর্শ সিদ্ধ করার জন্য যে সহিংস পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সমস্ত দেশে বিদ্বেষ ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত প্রাচীন রাজত্বের উত্তরজীবীদের অনেকে সাধারণতন্ত্রী ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যক্রমের ফলে প্রায় সমস্ত উনিশ শতক ধরে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ফরাসী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে। ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত যে সমস্ত সমস্যা অমীমাংসিত, ফরাসী বিপ্লবের আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধ তার অন্যতম কারণ।

আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের মতবাদগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করাই ছিল রুশ বিপ্লবের আদর্শ। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে সুস্থমস্তিষ্ক কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু সহিংস এবং বিদ্বেষপূর্ণ পদ্ধতির ফলে এই মহৎ বিপ্লব মূলেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারের ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংঘাতের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়। হিংসার পথ অবলম্বনের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই বিদ্বেষ এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হল। তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত অথবা বাস্তুহারা হয়েছে। ব্যক্তির দোষ গুণের বিচার না করে কেবলমাত্র জন্মগত পরিস্থিতির দ্বারা সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সঙ্গে বাইরের সংঘাত অনিবার্য ভাবে জড়িত হয়ে পড়ল। বৈদেশিক শত্রুতা সোভিয়েতবাসীদের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে হয়তো তুলেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধ না থাকলে বহির্যুদ্ধ সত্ত্বেও সোভিয়েট নাগরিকদের এত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হত না।

ভারতীয় বিপ্লবে এ ধরনের হিংসা, দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের পরিচয় অনেক কম। সামাজিক পরিবর্তনের যুগে ব্যক্তির খানিকটা কষ্ট ভোগ বোধ হয় অনিবার্য কিন্তু ভারতবর্ষে সে দুঃখভোগ তীব্র হয়ে উঠে নি। তাই ইতিহাসের সার্থক বিপ্লবের মধ্যেও ভারতীয় বিপ্লবের স্থান অনন্যসাধারণ। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের

যুগেও হিংসামূলক কার্যক্রম ব্যাপক হয় নি। যুক্তি, আলোচনা এবং আপোষের মধ্য দিয়েই স্তরে স্তরে ভারতবর্ষ অধিকার অর্জন করে। শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায় অবলম্বন করলে ব্যক্তি ও জাতির যে কল্যাণ, তার অন্যতম উদাহরণ মেলে স্বাধীনতার পরে বৃটেন ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে। স্বাধীন ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হল। সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আর পূর্বে কখনো ঘটেনি। শুধু অন্য দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ বলে নয়, নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ভারতবর্ষের অহিংস আদর্শ ও কার্যক্রম অপূর্ব সুফল দিয়েছে। সমস্ত রাজকীয় প্রথার অবসান ঘটল, কিন্তু একটি রাজাও প্রাণ হারাল না। তারা তাদের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য হারাল, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির দ্বারা বিপ্লব সাধিত হয়েছিল বলে পূর্ব যুগের রাজন্যবর্গ আজ ভারতের দেশভক্ত নাগরিক রূপে পরিচিত। ধনিক বণিক মহাজনদের উপর গুরু করভার চাপান হল, জমিদারী প্রথার অবসান ঘটল, এবং পুঁজিপতিদের জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এল, কিন্তু অহিংস উপায়ে সাধিত হয়েছে বলে এই বিপ্লবের ফলে হিংসা ও দ্বেষের উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়নি। ফরাসী অথবা রুশ বিপ্লবের পরিণামে দেশের মধ্যেই যে ভাবে বিরোধী এবং যুযুধমান শক্তি গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে সে ধরনের বিরোধী এবং শত্রু ভাবাপন্ন কোন অন্তর্শক্তির পরিচয় মেলেনা।

যে দুঃখবহ ঘটনাবলীর ফলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই অহিংস নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়িত্ব বণ্টনের সময় আজো আসেনি, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তখন যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তা কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী। দেশ বিভাগের ফলে যে নূতন সীমান্ত রচিত হল, তার দুইদিকেই জনসাধারণের মধ্যে হিংসার যে ব্যাপক প্রকাশ দেখা দিল, নিজের জীবন দান করে মহাত্মা গান্ধী তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তাঁর আত্মদানের ফলে জনসাধারণের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণা দেখা দেয়। সুরু থেকেই তাই কংগ্রেস তাঁর নীতি ও নির্দেশের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করবার চেষ্টা করছে। অনেক সমস্যার এভাবে সমাধান হয়েছে, এবং আশা করা যায় যে বাকী সমস্যাগুলির সমাধানও এইভাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সম্ভব হবে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর সকলদেশের মানুষের সঙ্গেই

ভারতবর্ষ এই নীতির ভিত্তিতে সমন্বয় গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস অহিংসনীতি ও গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে বলেই আজ ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বিরাজমান।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে স্বীকার করেই কংগ্রেসের মতবাদ গড়ে উঠেছে। নূতনকে গ্রহণ করবার শক্তি ও পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনই সে ঐতিহ্যের মর্মকথা। যেখানেই মানবত্বের প্রকাশ, বিনা প্রশ্নে ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেছে, তার উৎস কোথায়, তা নিয়ে বাদবিচার করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও জটিলতা নিয়ে অনেকে কটাক্ষ করেছেন, বলেছেন যে এরকম পাঁচমেশালী সংস্কৃতির মধ্যে আভ্যন্তরিণ দুর্বলতা থাকবেই। ইতিহাস কিন্তু অন্যকথা বলে। অজটিল ও একধর্মী বহু সংস্কৃতি চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু বহুমুখী জটিল ভারতীয় সভ্যতা কালপ্রবাহকে জয় করে আজো সজীব ও প্রাণবন্ত।

ভারতীয় ঐতিহ্যে যে জটিলতা ও বৈচিত্র্য, কংগ্রেস মতবাদেও তার পরিচয় মেলে। যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাই কংগ্রেস মতবাদ বদলিয়েছে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কংগ্রেস সংশোধন ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করেনি, বরং যখনি প্রয়োজন হয়েছে সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় সংস্কার ও পরিমার্জনকে স্বীকার করে নিয়েছে। গত পচাত্তর বৎসর কংগ্রেস যেভাবে নূতন নূতন মতবাদকে গ্রহণ করেছে, আজো কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের মধ্যে নূতনকে গ্রহণ করবার সেই শক্তি পরিস্ফুট।

অতীতে কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। সে যুদ্ধে জয়লাভের পরে আজ কংগ্রেস যে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তার লক্ষ্য যে প্রত্যেকটি নাগরিক দেশের বৃহত্তম নীতি নির্দ্ধারণে অংশীদার হয়ে দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসেও পঞ্চায়েত রাজের পরিকল্পনার পরিচয় মেলে, কিন্তু সেই পুরাতন আদর্শের মধ্যে কংগ্রেস আজ নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে প্রয়াসী। কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে আজ বিকেন্দ্রিকরণের ভিত্তিতে স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশের পরিচয় মেলে। পঞ্চায়েত রাজের পরিকল্পনায় কংগ্রেস তাই আজ দেশ ও বিদেশের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কার্যকরী করতে অগ্রসর। অধিক ক্ষমতা দানের সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহারের অবকাশও বাড়ে, কিন্তু জনসাধারণ যদি ভুল করবার অধিকার না পায়, তবে গণতন্ত্র কোনদিনই বাস্তব হতে পারে না। কংগ্রেস তাই পঞ্চায়েতের হাতে ব্যাপকতর ক্ষমতা দিয়েছে. অনভিজ্ঞ হাতে শক্তির

অসদ্ব্যবহার হতে পারে, এ আশঙ্কায় গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে নাই। দেশের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মতন কংগ্রেসও আশা করে যে ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পাবে, এবং তাদের মধ্যে সৃজনমূলক সহযোগ ও সক্রিয় নেতৃত্বের যে সমস্ত গুণ এখন নিহিত হয়ে আছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি বিকশিত হয়ে সমাজের কল্যাণ সাধন করবে।

পঞ্চায়েত রাজ স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য আরো বেড়ে যাবে। বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের হাতে শক্তি এলে তারা নিজ নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করবে, এটা বোধ হয় স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন যে এ ধরণের আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক। তাঁরা তাই পঞ্চায়েত রাজ স্থাপনে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, বলছেন যে পঞ্চায়েত রাজের ফলে বৈচিত্র্য এত বেশী বেড়ে যাবে যে তার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। একটা সহজ সত্য তাঁরা ভুলে যান। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হয় না, বরং বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে সবাইকে একই সাজে ঢালবার চেষ্টা করলেই জাতির সংহতি ক্ষুন্ন হয়। জোর করে একীকরণের চেষ্টা করলেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তার ফল ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় জাতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়, এবং ফলে জাতীয় সংহতি অধিকতর শক্তিশালী হয়। পঞ্চায়েত রাজ স্থাপনের ফলে প্রত্যেক অঞ্চল নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারবে, অথচ ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতি সবাই গ্রহণ করবে বলে তাদের মধ্যে ব্যাপকতর ঐক্যের পরিচয়ও সমান কার্যকরী হবে। এই সমন্বয়ের ফলে পঞ্চায়েত রাজের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শক্তিকে বাড়াবে, দুর্বল করবে না।

কংগ্রেসী আদর্শের প্রভাবে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের বহু আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শ পুরোপুরী রক্ষা হয়নি, একথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে মোটের উপর বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে ভারতবর্ষ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। ঐক্যের নামে বৈচিত্র্যকে দমন করবার চেষ্টার বদলে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভারতবর্ষের লক্ষ্য। এভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতবর্ষ যে সমন্বয় সাধন করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে সেই সমন্বয় সাধনই আজ বিশ্বমানবের সব চেয়ে বড় সাধনা! ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কার, মতবাদ ও

ঐতিহ্যের সহঅবস্থানের পরিচয় মেলে. তাই ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে যে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ও বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ও সমাজব্যবস্থার সহ-অবস্থান সম্ভব। বিজ্ঞান ও টেকনিকের প্রগতির ফলে আজ পৃথিবীতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অহিংস উপায়ে বিভিন্ন ও বিরোধী জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে না পারলে সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। অহিংস উপায়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বহু সমস্যার সমাধান করে এবং বৈচিত্র্যকে বিশ্বসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে ভারতবর্ষ যে আদর্শ স্থাপন করেছে, বর্তমান আণবিক যুগে সমগ্র পৃথিবীর জন্য তাই একমাত্র কল্যাণের পথ।

১৯৫৯